শিবরামের
মজার গল্প

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

শিবরামের মজার গল্প

সম্পাদনা
আবদুশ শাকুর

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩২৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
চৈত্র ১৪১৭ মার্চ ২০১১

প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৮ জানুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৬৭ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0325-X

ভূমিকা

শোনা যায় শিবরাম চক্রবর্তীর রচনা এখনকার ছোটরা কম পড়ে। এর নানান কারণও শোনা যায়। এক সত্য হল এখনকার উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত মহলের অনুকরণে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাও না-খেয়ে না-দেয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার চেষ্টা করছে, ফলে তারা বাংলা গল্পের বই-ই পড়ছে কম। আরেক সত্য হল বর্তমানে বাংলা ভাষার ছোটদের সাহিত্য রক্তাল্পতায় ভুগছে। বিচিত্র রসের আয়োজন এ-সাহিত্যের একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। ফলে হ্যারি পটারের পাঠকদের মাতৃভাষার সাহিত্যের দিকে মন টেনে রাখার মতো সম্পদেরও অভাব ঘটছে। বাংলা পড়লেও, হালের প্রজন্ম হ্যারি পটারের অনুবাদই পড়ছে; হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন-টেনিদা-ফেলুদা পড়ছে না—জানতেও পারছে না যে শিবরামে-সত্যজিতেও অনেক রকম হ্যারি পটার আছে।

এই অবস্থায় বাংলা সাহিত্যেরই উজ্জ্বল অতীতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেও বালকমনের পুষ্টি ঘটানো যায়। ফল ফলানো যায় 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' বলে 'পরধনলোভে মত্তদের' আমন্ত্রণ জানিয়ে। এই 'বিবিধ রতনে'র মধ্যেও শিবরামের ঔজ্জ্বল্য নবকিশোর-যুবকদের চোখ ধাঁধাবে যদি বিস্মরণের ঘূর্ণাবর্ত থেকে তাঁকে উদ্ধার করা যায়। ধন্যবাদ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে—শিবরামের উদ্ধারকার্যে তাঁদের এই সময়োচিত প্রয়াসের জন্য।

অদূর ভবিষ্যতেই গবেষক মহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—বিশ শতকের কথাসাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তী-নামের লেখক কত জন ছিলেন? যিনি শিশু-কিশোর সাহিত্যের আসরে অনাবিল মজার গল্পের ভাণ্ডারী ছিলেন, তিনিই কি গুরুগম্ভীর সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধ 'আজ এবং আগামীকাল' (১৯২৯), 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' (১৯৪৩) লিখেছিলেন? হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন সিরিজের গল্পকারই কি বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে লেখা 'চাকার নীচে' (১৯৩০) এবং 'যখন তারা কথা বলবে'র (১৯৪৯) নাট্যকার ছিলেন?

বস্তুত শিবরাম চক্রবর্তীর এই সমস্ত পরিচয় তাঁর মাঝবয়স থেকেই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। তিনি আপন করে নিয়েছিলেন শিশু-কিশোরদের জগতটাকেই। তবে একাল থেকে পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে—তাঁর সব লেখা মিলিয়ে যেন একটা বিরাট বাগান, যার মধ্যে সর্ববয়সী পাঠকই মনের সুখে বিচরণ করতে পারে। কারণ সারাটা জীবনই তিনি সকলের সঙ্গে একই বয়েসের থেকে

গিয়েছেন। ছোটদের জন্যে শিবরামের অনেক লেখাই বড়দের চিত্তবিনোদনের ক্ষমতা রাখে, এক অর্থে সব লেখাই। কারণ পাঠককে তাঁর বালবয়েস ফিরিয়ে দিতে জানেন শিবরাম। আর কে-না তাঁর শৈশব-কৈশোর ফিরে পেতে ভালো না-বাসবেন, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও।

খ্যাতির প্রতি শিবরামের মতো সম্পূর্ণ মোহমুক্ত লেখক বাংলা সাহিত্যে আরো আছেন কিনা আমি জানি না। কলকাতার বিখ্যাত কফি হাউসে একদল ছেলেমেয়ে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে একদিন তাঁকে ঘিরে ধরে বললো—আমরা আপনার ভক্তদল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা তাহলে আমাকে হেমেন্দ্রকুমার রায় বলে ভেবেছো? বাপ রে বাপ, কত বড় লেখক তিনি। কেউ কখনো তাঁকে হয়তো বললো—আপনার অমুক লেখাটা কী যে ভালো লাগলো! অমনি কথা ঘুরিয়ে তিনি বলবেন, বুদ্ধদেব বসুর লেখা পড়েছো? কী দারুণ লেখে! আর প্রেমেন্দ্র মিত্র, ওরকম কি কেউ লিখতে পারে? আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়? সে কি জোর তাঁর কলমে! 'দেবতার জন্ম'র মতো গল্প বেশি লিখলেন না কেন, কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলতেন—দেখ, মানিক লিখছে, তারাশঙ্কর, বিভূতিবাবু লিখছেন, বাপ রে বাপ কী ভালো লেখা; আমি কি ওসব পারি?

এই মানুষটিই স্বভাবসুলভ শিবরাম চক্রবর্তী। স্বভাবসুলভ? হাঁ যেমন স্বভাবসুলভ তাঁর শব্দবন্ধ 'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি', 'চটির সঙ্গে চটাচটি', 'হাতির সঙ্গে হাতাহাতি' ইত্যাদি। এ রকম শব্দাশব্দি বালক-বৃদ্ধ যে-কারো মুখে, জীবুতি-তাহিতি যে-কোনোখানে উচ্চারিত হোক না কেন—অমনি শ্রোতা বলে উঠবে, কথাটা-যে শিবরামের মতো হয়ে গেল। এ তো কম কথা নয়, যে-কোনো লেখকের জন্যই।

শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম চাঁচলের অভিজাত রাজ-পরিবারে। স্বদেশী আন্দোলনের ডাকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা না দিয়েই কলকাতায়, অচিরেই জেলখানায়, রাস্তায় খবরকাগজ ফেরি, মার্বেল-প্যালেসের মল্লিকদের লঙ্গরখানায় আহার, ইঁটে মাথা রেখে ফুটপাতে নিদ্রা। সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক ইত্যাদি নানাঘাটের জল খাওয়ার পর লেখক হওয়া—তা-ও এক দৈত্যপ্রায় কাবুলিওয়ালার তাড়নায়। ব্যাটার কাছ থেকে শিবরামকে মাসিক ১৫ টাকা সুদে দেড়শ টাকা ধার নিতে হয়েছিল। নিজের খাই-খরচ মিটিয়ে প্রতি মাসে কাবুলির খাঁই মেটানো! ধরলেন কলম চালানো। চিরদিন সেই কলমই শিবরামের জীবিকার একমাত্র হাতিয়ার হয়ে ছিল।

তিনটি বিষয়ে তাঁর নেশা ছিল প্রচণ্ড। ভোজন, নিদ্রা আর সিনেমা। পথ চলেছেন, সেই সঙ্গে মুখও চলেছে। হাতে বাদামের ঠোঙা কিংবা চানাচুর-প্যাকেট। যাতায়াতের পথে ঘুগনী-আলুকাবলিওলার দেখা পেলে তাদেরও নিরাশ করতেন না। সঙ্গে সঙ্গী থাকলে সে-ও ভাগ পেত! তবে তাঁর ফেভারিট রাবড়ির বেলায় তা

হত কি না কে জানে। ছোটবেলায় রোগা লিকলিকে ছিলেন। প্রথম স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছিল জেলের খাদ্য খেয়ে। তার পর থেকে তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্ষিধে পায়, সময়মতো না-খেলে কাহিল হয়ে পড়েন। খাওয়ামাত্র ঘুম, ঘুম থেকে জেগে খাওয়া, খাওয়ার পর আবার ঘুম, ঘুম থেকে উঠে ফের খাওয়া। সারাদিন পর্যায়ক্রমে এই ভাবে চলে। সন্ধ্যার দিকে আড্ডা দিতে বের হন। নাইট-শো সিনেমা দেখে মেসে প্রত্যাবর্তন। রাতে লম্বা ঘুম দিয়ে পরদিন সকাল নটায় জাগরণ। শুরু হয় তাঁর ধারাবাহিক রুটিন মাফিক আরেকটি দিন। বিস্মিত এক ভদ্রলোক একবার জিজ্ঞাসা করেছিল—'সারাদিন এভাবে ঘুম আর খাওয়া নিয়ে সময় কাটে, তা হলে লেখেন কখন?' ততোধিক বিস্মিত শিবরামের জবাব : 'কেন, পরদিন!' শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে ১৯৬০ সালে তিনি 'মৌচাক' পুরস্কার পান। ১৯৭৫ সালে পান আনন্দ পুরস্কার। বিদ্যাসাগর পুরস্কার পান মরণোত্তর।

জীবনের মতো সাহিত্যেও হাস্যরসের বিকল্প হয় না। সেই বন্ধুই জনপ্রিয়, যে হাসাতে পারে। একজন ভাঁড় ছাড়া কোনো রাজসভা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এমনকি শেক্সপিয়রের নাটকও ক্লাউন ছাড়া জমে না। সাহিত্যের পাতায় দেখা যাবে যে রূপকথার কাহিনী-বুননে কৌতুকের জন্য ফাঁক রাখা হয়েছে, যেমন সুরবিহারের ফাঁক রাখা হয় রাগপ্রধান গানে। এভাবে বীরবল-গোপালদের গল্পগুলো বহুপল্লবিত হয়ে লোকরুচিকে রসসিক্ত করে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথও তাঁদের গম্ভীর সমালোচনা-উপদেশনার ফাঁকে ফাঁকে বইয়ে দিয়েছেন নানারকম হাসির সঙ্গে নানারকম খুশির হাওয়া। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর যাবতীয় রচনা রন্ধনই করেছেন হাস্যরসের মশল্লা দিয়ে। অতঃপর মহারথীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'উজ্জ্বল শুভ্র হাস্যে'র কত বিচিত্র রঙই-না ছড়ালেন সুকুমার, রাজশেখর, মুজতবা তাঁদের বহুভঙ্গিম রচনায়। কিন্তু ছাদফাটানো-রসায়নের হাসি আমদানি করলেন কেবল একজনই, তিনি শিবরাম চক্রবর্তী।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শিবরামের মজার গল্পের এ সংকলনটি প্রকাশ করেছেন এজন্যে যে, মন খারাপ হলে পাঠকমাত্রই যেন শিবরামকে হাতের কাছে পায়। জীবনকে বিষণ্নতার কবল থেকে উদ্ধার করতে এবং পৃথিবীটাকে আরেকটু ভালো লাগাতে সকলেই যেন তাঁর সাহায্য চায়। হাসির ব্যায়াম করতে আমরা যেন তাঁর কাছে যেতে শিখি। এমন দায়িত্বহীন হাসি, মজাদার ভাষায় বেঁধে আর কে-ই বা আমাদের উপহার দিয়েছেন। নিজেও তিনি নিজেকে 'ক্লাউন' বলতেই ভালোবাসতেন। লিখেওছেন যে তাঁর গল্পে পাঠকের, বোধশোধ নয়, আমোদ হয় :

বলে গেছেন উপনিষদ আরাম নাহি অল্পে
বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ শিবরামের গল্পে।

আবদুশ শাকুর
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

১১ মার্চ ২০১১

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সূচি

ঋণং কৃত্বা	১১
পণ্ডিতবিদায়	১৫
পৃথিবীতে সুখ নেই	২১
সিট+আরাম = সিটারাম	২৯
কল্কেকাশির কাণ্ড	৩৬
আমার সম্পাদক শিকার	৫০
সমস্যার চূড়ান্ত	৬৩
যখন যেমন তখন তেমন	৭৪

ঋণং কৃত্বা

কারো ধার ধারি না, এমন কথা আর যে-ই বলুক আমি কখনওই বলতে পারি না। আমার ধারণা, এক কাবুলিওয়ালা ছাড়া এ-জগতে একথা কেউই বলতে পারে না। অমৃতের পথ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশ্চিতা'; অকালে মৃত না হতে হলে ধার করতেই হবে।

ধার হলেও কথা ছিল বরং, কিন্তু তাও নয়। বাড়িভাড়া বাকি, তাও বেশি না, পাঁচশো টাকা মাত্তর! কিন্তু তার জন্যেই বাড়িওয়ালা করাল মূর্তি ধরে দেখা দিলেন একদিন—

'আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি, কোনো অজুহাত শুনছি না আর—'

'ভেবে দেখুন একবার,' আমি তাঁকে বলতে যাই : 'এই সামান্য পাঁচশো টাকার জন্যে আপনি এমন করছেন! অথচ এক যুগ পরে একদিন—আমি মারা যাবার পরেই অবিশ্যি—আপনার এই বাড়ির দিকে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, একদা এখানে বিখ্যাত লেখক শ্রীঅমুকচন্দ্র বাস করতেন।'

'বাস করতেন! বাস করে আমার মাথা কিনতেন!' জবাবে তাঁর দিক থেকে যেন ঝাপ্‌টা এল—'শুনুন মশাই, আপনাকে সাফ কথা বলি—যদি আজ রাত্রি বারোটার ভেতর আমার টাকা না পাই তাহলে এক যুগ পরে নয়—কালকেই লোকে এই কথা বলবে।'

বাড়িওয়ালা তো বলে গেলেন, চলেও গেলেন। কিন্তু এই এক বেলার মধ্যে এত টাকা আমি পাই কোথায়? পাছে ধার দিতে হয় সেই ভয়ে সহজে কেউ আমার মতো লেখকের ধার ঘেঁষে না। লেখকমাত্রই ধারালো, আমি আবার তার ওপর এক কাঠি—জানে সবাই।

হর্ষবর্ধনের কাছে যাব? তাদের কাছে এই ক-টা টাকা কিছুই নয়। কীর্তিকাহিনী লিখে অনেক টাকা তাদের পিটেছি, এখন তাদের পিঠেই যদি চাপি গিয়ে? তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি এই দায় থেকে উদ্ধার পাই?

গিয়ে কথাটা পাড়তেই হর্ষবর্ধন বলে উঠলেন—'নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনাকে দেব না তো কাকে দেব!'

চমকে গেলাম আমি। কথাটা যেন কেমনতরো শোনাল।

'আপনি এমন কিছু আমাদের বন্ধু নন?' তিনি বলতে থাকেন।

'বন্ধুত্বের কথাই যদি বলেন—' আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই।

'হ্যাঁ, বন্ধুত্বের কথাই বলছি। আপনি তো আমাদের বন্ধু নন। বন্ধুকেই টাকা ধার দিতে নেই, মানা আছে। কেন-না তাতে টাকাও যায়, বন্ধুও যায়।' তিনি জানান: 'তবে হ্যাঁ, এমন যদি সে বন্ধু হয় যে বিদেয় হলে বাঁচি—তার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে ঐ ধার দেওয়া। তা হলেই চিরকালের মতন নিস্তার!'

আহা! আমি যদি ওঁর সেই দ্বিতীয় বন্ধু হতাম—মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'কিন্তু আপনি তো বন্ধু নন, লেখক মানুষ। লেখকরা তো কখনও কারো বন্ধু হয় না।'

'লেখকদেরও বোধহয় কেউ বন্ধু হয় না।' সখেদে বলি।

'বিলকুল নির্ঝঞ্ঝাট! এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে, বলুন?' তিনি বলেন, 'আপনি যখন আমাদের আত্মীয়-বন্ধু কেউ নন, নিতান্তই একজন লেখক, তখন আপনাকে টাকা দিতে আর বাধা কী? কত টাকা দিতে হবে বলুন?'

'বেশি নয়, শ-পাঁচেক। আর একেবারে দিয়ে দিতেও আমি বলছি না।' আমি বলি: 'আজ তো বুধবার। শনিবারদিনই টাকাটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব।'

কথা দিলাম। এ ছাড়া আজ বাড়িওয়ালার হাত থেকে ত্রাণ পাবার আর কী উপায়! কিন্তু কথা তো দিলাম, না ভেবেই দিয়েছিলাম কথাটা—শনিবারের সকাল হতেই ওটা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়াল।

ভাবতে ভাবতে চলেছি, এমন সময় গোবর্ধনের সঙ্গে মোলাকাত—অকূল পাথারে, চৌরাস্তার মোড়ে।

'গোবর্ধন ভায়া, একটা কথা রাখবে? রাখো তো বলি।'

'কী কথা বলুন?'

'যদি কথা দাও যে, তোমার দাদাকে বলবে না, তাহলেই বলি।'

'দাদাকে কেন বলতে যাব? দাদাকে কি আমি সব কথা বলি?'

অন্য কিছু কথা নয়, কথাটা হচ্ছে এই, আমাকে শ-পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারো—দিন কয়েকের জন্যে? আজ তো শনিবার? এই বুধবার সন্ধের মধ্যেই টাকাটা আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব।'

'এই কথা?' এই বলে আর দ্বিরুক্তি না করে শ্রীমান গোবরা তার পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট বার করে দিল।

টাকাটা নিয়ে আমি সটান শ্রীহর্ষবর্ধনের কাছে।

'দেখুন, আমার কথা রেখেছি কি না। দরিদ্র লেখক হতে পারি, কথা নিয়ে খেলা করতে পারি—কিন্তু কথার খেলাপ কখনও করি না।'

হর্ষবর্ধন নীরবে টাকাটা নিলেন।

'আপনি তো ভেবেছিলেন যে টাকাটা বুঝি আপনার মারাই গেল, আমি আর এ-জন্মেও এমুখো হব না। ভাবছিলেন যে—'

'না না। সে-সব কথা আমি একেবারেই ভাবিনি। টাকার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করুন, টাকাটা আপনাকে দিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি কিন্তু ফেরত পেয়ে এখন বেশ ভাবিত হচ্ছি।'

'ভাবছেন এই যে, এই পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ক্রেডিট খাটিয়ে এর পরে আমি ফের হাজার টাকা ধার নেব। তারপরে সেটা ফেরত দিয়ে আবার দু-হাজার চাইব। আর এমনি করে ধারটা দশ হাজারে দাঁড় করিয়ে তারপরে আর এ-ধারই মাড়াব না? এই তো ভাবছেন আপনি? এই ভেবেই তো ভাবিত হয়েছেন, তা-ই না?'

আমি তাঁর মনোবিকলন করি। তাঁর সঙ্গে বোধহয় আমার নিজেরও!

তিনি বিকল হয়ে বলেন, 'না না, সে-সব কথা আমি আদৌ ভাবিনি। ভাবছি যে এত তাড়াতাড়ি আপনি টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন! আর এত তাড়াতাড়ি আপনার প্রয়োজন কী করে মিটতে পারে? বেশ, ফের আবার দরকার পড়লে চাইতে যেন কোনো কুণ্ঠা করবেন না।'

বলাই বাহুল্য! মনে মনে আমি ঘাড় নাড়লাম। লেখকরা বৈকুণ্ঠের লোক, কোনো কিছুতেই তাদের কুণ্ঠা হয় না।

বুধবার দিনই দরকারটা পড়ল আবার। হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে গোবর্ধনকে গিয়ে দিতে হল।

'কেমন গোবর্ধন ভায়া! দেখলে তো, কথা রেখেছি কি না। এই নাও তোমার টাকা—প্রচুর ধন্যবাদের সহিত প্রত্যর্পিত।'

বুধবার আবার গোবরার কাছে যেতে হল। পাড়তে হল কথা—'গোবর্ধন ভায়া, বুধবারে টাকাটা ফেরত দেব বলেছিলাম, বুধবারেই দিয়েছি, দিইনি কি? একদিনের জন্যেও কি আমার কথার কোনো নড়চড় হয়েছে?'

'এমন কথা কেন বলছেন?' গোবর্ধন আমার ভণিতা ঠিক ধরতে পারে না।

'টাকাটা আমার দরকার পড়েছে আবার। ওই পাঁচশো টাকাই—সেইজন্যেই তোমার কাছে এলাম ভাই! এই বুধবারই তোমায় আবার ফিরিয়ে দেব টাকাটা। নির্ঘাত।'

এইভাবে হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন, গোবর্ধন আর হর্ষবর্ধন—শনিবার আর বুধবারের দুধারের টানা-পোড়েনে আমার ধারিওয়াল কম্বল বুনে চলেছি, এমন সময়ে পথে একদিন দু-জনের সঙ্গে দেখা।

দুই ভাই পাশাপাশি আসছিল। আমাকে দেখে দাঁড়াল। দুজনের চোখেই কেমন যেন একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

হয়তো দৃষ্টিটা কুশল-জিজ্ঞাসার হতে পারে, কোথায় যাচ্ছি, কেমন আছি— এই ধরনের সাধারণ কোনো কৌতূহলই হয়তো-বা, কিন্তু আমার তো পাপ মন! মনে হল দু-জনের চোখেই যেন এক তাগাদা!

'হর্ষবর্ধনবাবু, ভাই গোবর্ধন, একটা কথা আমি বলব, কিছু মনে কোরো না—' বলে আমি শুরু করি : 'ভাই গোবর্ধন, তুমি প্রত্যেক বুধবার হর্ষবর্ধনবাবুকে পাঁচশো টাকা দেবে। আর হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি প্রত্যেক শনিবার পাঁচশো টাকা আপনার ভাই গোবর্ধনকে দেবেন। হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি বুধবার, আর গোবর্ধন, তুমি শনিবার—মনে থাকবে তো?'

'ব্যাপার কী?' হর্ষবর্ধন তো হতভম্ব।—'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ব্যাপার এই যে, ব্যাপারটা আমি একেবারে মিটিয়ে ফেলতে চাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না।'

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

পণ্ডিতবিদায়

পদ্মলোচন পোস্টাপিস থেকে ফিরছে, মানসের সঙ্গে দেখা হল পথে।

"তোর হাতে ওসব কী রে?"

পদ্মলোচন বলল—"যত রাজ্যের খবরের কাগজ। স্টেটসম্যান, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট এইসব। বাবা পড়েন। হ্যাঁ রে মানকে, পণ্ডিতমশাই আমাদের খাতা দেখেছেন? কত নম্বর পেয়েছি আমি?"

মানস গম্ভীরভাবে জবাব দিল—বোধহয় এগারো।

"মোটে? আর তুই?"

"পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে নেবখন। ভাগ্যিস এগারো পাইনি, তা হলে কী মুশকিল যে হত! একশোর মধ্যে একশো দশ তো আর পাওয়া যায় না?"

"আর সব ছেলেরা?"

"তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস পাঁচ, মাইনাস সাত পেয়েছে: তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েন্টে'—সব বিলো 'জিরো'।"

পদ্মলোচন হাসতে পারল না।—"তোর আর কী, তুই পণ্ডিতের ছেলে; তোকে তো আর কিছু বলবেন না! মার খেয়ে মারা যাব আমরা।"

পদ্মলোচন বাড়ি ফিরে যেন ভাবনার অকূল পাথারে পড়ল। সংস্কৃতে মোটে এগারো পেয়েছে! তার ওপর পণ্ডিতমশায়ের আবার সবচেয়ে বেশি রাগ তারই ওপর—সে তাঁর কথার চোটপাট জবাব দেয় বলে। সেদিন তো বেঞ্চির নড়বড়ে পায়াটা ভেঙে নিয়েই ঘা তাকে কশাবেন এমনি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছিলেন; পদ্মর সৌভাগ্যক্রমে বেঞ্চিটা তার পক্ষ নিয়েছিল তাই রক্ষে—অনেক টানাটানিতেও কিছুতেই পায়াটা ছাড়তে সে রাজি হয়নি। অবাধ্য বেঞ্চিটাকে পদচ্যুত করতে না পেরে সে-যাত্রা তাদের দুজনকেই তিনি পরিত্রাণ দিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর যে রাগ সে দেখেছে, এর পরে ফের ইস্কুলে গেলে কি আর নিস্তার আছে?

খবরের কাগজগুলো বাবাকে দেওয়া তার হল না, নিজের পড়ার টেবিলে ফেলে রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে সে ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে সমস্ত যখন তার এলোমেলো হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল একটা পথ যেন পাওয়া গেল পণ্ডিতমশাইকে জব্দ করবার.....একটা উপায় যেন সে

www.alorpathsala.org

আবিষ্কার করেছে। সংবাদপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে হাসিমুখে টেবিল থেকে উঠল।

ইস্কুলে গিয়ে শুনল, সংস্কৃত পরীক্ষায় তাদের নম্বরের বহর দেখে হেডমাস্টারমশাই এমনই হতভম্ব হয়ে গেছেন যে তিনি স্বয়ং আজ পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে আসবেন। খবর পেয়ে পদ্মলোচন খুশিই হল। সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে—আজ একটা বিহিত সে করবেই; তার নাম পালটে ধূম্রলোচন বলে ডাকার, যখন-তখন বেধড়ক পিটন দেওয়ার প্রতিশোধ আজ তাকে নিতেই হবে। ক্লাসে ঢুকে নাকে নস্যি গুঁজে চল্লিশ মিনিট তিনি ঘুমিয়ে সুখ করবেন, আর বাকি দশ মিনিট সুখ করবেন পড়া নেবার অছিলায় তাদের পিটিয়ে—এটি আর হচ্ছে না। পদ্মলোচন মরিয়া আজ।

হেডপণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকলেন। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—"সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল করলে কী করে হে?"

ছেলেরা নিরুত্তর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের কোনো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল নাকি?"

পদ্মলোচন জবাব দিল—"পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান না সার।"

পণ্ডিতমশাই চোখ পাকিয়ে বললেন—"কী? অধ্যাপনা করি না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!"

হেডমাস্টারমশাই পণ্ডিতকে বাধা দিলেন—"আপনি থামুন। কী বলবার আছে তোমার বলো।"

"সেদিন আমি পণ্ডিতমশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা করলুম, অবিশ্যি পড়ার বইয়ের বাইরে। আনসিন প্যাসেজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে। তা পণ্ডিতমশাই তার মানেই বললেন না।"

পণ্ডিতমশাই রাগে ফুলতে লাগলেন—"কী? কোন শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই? শ্লোকার্থ জানি না—আমি"!

দাঁত কিড়মিড় করে পণ্ডিতমশাই যেন ফেটে পড়তে চাইলেন—"নিয়ে আয় তোর কোন শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই!"

হেডমাস্টার আশ্বাস দিলেন—"বলো ভয় কী! তোমার মনে নেই বুঝি?"

পদ্মলোচন ঘাড় নাড়ল—"হ্যাঁ, মনে আছে আমার। এই শ্লোকটা সার—

হবার্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেডুয়ে।
আপ্তীবঃ অগুফ্রয়েণ মানস্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ ॥

শ্লোক শুনে পণ্ডিতমশায়ের চোখ কপালে উঠল। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন তাঁর সারা জন্মে এমন অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন কি না। পণ্ডিতকে নিঃশব্দ দেখে হেডমাস্টারমশাই বুঝতে পারলেন শ্লোকটা তেমন সহজ নয়; তাই তাঁকে উৎসাহ দেয়া তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন—"একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন; উপনিষদ কিংবা পাঁজির বোধহয়, কী বলেন?"

পণ্ডিতমশাই মাথা চুলকাতে লাগলেন—"কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ করে দেব। ও যেন মানকের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ি যায়।"

পদ্মলোচন বলল—"না সার, সামনে দুর্গাপুজো, আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না সার।"

পণ্ডিতমশায়ের প্রহারের ভয়ানক প্রসিদ্ধি ছিল। হেডমাস্টার পদ্মলোচনের ভয় দেখে হাসতে লাগলেন—পণ্ডিতমশাই, ওটা কাল আপনি স্কুলে বলবেন, তা হলেই হবে। আমারও জানায় কৌতূহল হয়েছে। একটু ঘেঁটে দেখবেন, পাঁজির কিংবা উপনিষদের হবে—ওই দুটোই তো আমাদের যত রাজ্যের শ্লোকের আড়ত!

পণ্ডিতমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—"বেশ, আমার স্মরণে রইল।"

বাড়ি ফিরে পণ্ডিতমশাই শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে পড়লেন; উদ্ভট-সংগ্রহটাও পাতিপাতি করে খুঁজলেন। কোনোদিকেই শ্লোকটার কোনো সুরাহা হল না। নাকে এক টিপ নস্য নিয়ে তিনি দারুণ মাথা ঘামাতে লাগলেন—'হবার্তাবা'? সংস্কৃত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এ-শব্দ নাই! বার্তা মানে তো সংবাদ কিন্তু 'হ.....বা'র মাঝখানে পড়ে এ তো বোধগম্য হবার বহির্ভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা'? হিপ্ত ছিল আশা হল হিপ্তাশা! কিন্তু হিপ্ত মানে কী? এ কি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত? 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবন করা কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ'-বা কী আর ঐ 'শকেডুয়ে'.....?

পণ্ডিতমশাই অসুখের অজুহাতে তিন দিন ছুটি নিলেন—কিন্তু তিন দিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেল তবু ইস্কুলে তাঁর পদার্পণ নেই! তখনও তিনি শ্লোকটার কিনারা করে উঠতে পারেননি! সেদিনই সকালে উদ্ভট কল্পতরু নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ কানে আসতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন—"কে যাচ্ছিস ওখান দিয়ে? টেটো?"

"উহুঁ।"

"মানকে নাকি? টেটোকে তামাক দিতে বল তো! কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।"

মানস বলল—"টেটো এখন কোথায় টোটো করছে কে জানে!"

"তবে তুই সাজ। গড়গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্রলোচনকে ডেকে আন তো একবার।"

"সে আসবে না।"

"বলিস, মাভৈঃ। আমি অভয় দিয়েছি। কোনো ভয় নেই অতঃপর।"

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগলে কিছু সুবিধা হবার আশা করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশই তাঁর কাছে সব ধোঁয়াটে ঠেকতে লাগল। 'আণ্ডীবঃ অণ্ডফ্রয়েণ'—এ যে কী বস্তু তার রহস্য ভেদ করা দূরে থাক অনুমান করতেও তিনি অপারগ!

"এই যে ধূম্রলোচন, এসেছ? বাবা পদ্মলোচন, আর প্রণাম করতে হবে না, বসো। তুমি কি শ্লোকটার সদর্থ জানো? জানো নাকি?"

"জানলে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার?"

"তাও তো বটে, তাও তো বটে। আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আণ্ডীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার হয়তো অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে সব্যসাচী।"

"কথাটা আণ্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।"

পণ্ডিতমশাই ঘনঘন তামাক টানতে লাগলেন—তবে—"সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও কিছু ভুল করনি? তাই তো—তবে—তাই তো!"

পদ্মলোচন চলে গেলে পণ্ডিতমশাই এবার বৃহৎ শব্দার্থ সংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। মানস সাহস সঞ্চয় করে বলল—"আমি ওর একটা লাইনের মানে করতে পারি, বাবা!"

বাবা অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুললেন—"কোন লাইনের?"

"দ্বিতীয় লাইনের, যদি 'আণ্ডীব'-এর জায়গায় আণ্ডিল হয়, আর 'শিবাঙ্গব'-এর জায়গায় হয় গবাংগব।"

পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তিনি মহামহোপাধ্যায় হয়ে হিমশিম খেয়ে গেলেন আর এই দুগ্ধপোষ্য বালকের মূঢ়তা দ্যাখো। আগে হলে তিনি মেরেই বসতেন, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা নিমজ্জমান লোকের মতো, তাই কুটো হলেও মানসকে তিনি আশ্রয় করলেন।

"কী শুনি?"

মানস তথাপি ইতস্তত করতে থাকে—"বলব?"

"বলতেই তো বলছি।"

"আণ্ডি লঃ! মানে এক আণ্ডিল, কিনা এক গাদা, অণ্ড ফ্রয়েণ অর্থাৎ অণ্ড মানে ডিম্ব.....ফ্রয়েণ মানে ফ্রাই করে অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে,—মানস্টেট মানস্টেট"

"ওইখানে তো আমারও আটকাচ্ছে রে!"—পণ্ডিতমশাই বিজ্ঞের মতো এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন—"ওই মানস্টেটই হল মারাত্মক। যত নষ্টের গোড়া!"

"আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি বাবা! মানস্টেট—বলব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে। অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।"

"বটে?" গম্ভীরভাবে পণ্ডিতমশাই বললেন—"সমস্তটা জড়িয়ে মানে কী হল তবে?"

"অর্থাৎ কিনা, একগাদা ডিম ভেজে মানস আর টেট গাবংগবঃ—গব গব করে গিলছে। বোধহয় ও দেখেছিল।"

দেখতে দেখতে পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, "কী, আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে তোদের এই জঘন্য কীর্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস? হংসডিম্ব কি কুক্কুটাণ্ড কে জানে!"

বলেই তিনি মানসের পৃষ্টপোষকতার মতলবে তাঁর পাদুকা উত্তোলন করেছেন। মানস নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে বলল—"ওইজন্যেই তো আমি বলতে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল বলেই তো বললাম।"

"মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল! আর, এখন যে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হল, তার কী!"

পণ্ডিতমহাশয়ের আস্ফালন কানে যেতেই পণ্ডিত-গৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। তিনি যে-ভাবে ও যে-ভাষায় মানসের পক্ষ সমর্থন করলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে অণ্ড-ফ্রয়েণের ব্যাপারে কেবল তাঁর সহানুভূতিই নয়, দস্তুরমতো সহযোগিতাও আছে। অগত্যা মানসকে মার্জনা করে দিয়ে পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর শ্লোকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হলেন।

ইস্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই লোক পাঠিয়েছিলেন পণ্ডিতমহাশয়ের খবর নিতে। আটদিন হয়ে গেল কেন তিনি ইস্কুলে আসছেন না—তাঁর কী হয়েছে?

পণ্ডিতমশাই উত্তর পাঠালেন—সমস্তই হয়েছে, বাকি কেবল 'শকেড্যুয়ে', ওইটা হলেই হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে হেডমাস্টার তো হতভম্ব! শ্লোকটার কথা তিনি কবেই ভুলে গেছেন; আর তা ছাড়া সংস্কৃত তাঁর আদপেই মনে থাকে না—উপনিষদের কী আর পাঁজিরই-বা কী!

তিনি ভাবলেন—পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো? কাল নিজে গিয়ে দেখতে হবে।

পরদিন পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে দেখলেন, সদর-দরজায় তালা লাগানো, তারই উপরে ঝুলছে To Let।

পণ্ডিতের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেছেন কেউ জানে না, বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়ে প্রতিবেশীদের কিছু না-বলে রাতারাতিই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

পদ্মলোচন পোস্টাপিস থেকে ফিরছে, যত রাজ্যের খবরের কাগজ তার হাতে। সরিতের সঙ্গে পথে দেখা হল।

সরিৎ বলল—"আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েছিলিস ভাই! পণ্ডিত বেচারা পালিয়ে বাঁচল।"

পদ্মলোচন শুধু হাসে।

"দারুণ শ্লোক বাবা! পণ্ডিতমশায় একেবারে 'টজেগেণঃ'। লাভের আশা ত্যাগ করে উধাও হলেন!"

পদ্মলোচন তবু হাসে।

"অবিশ্যি মানকে একটা মানে করেছিল বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করে ওটা বেঁধেছিস?"

পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না—"মানকের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে!"

সমুৎসুক হয়ে সরিৎ জিজ্ঞেস করে—"তবে আসল মানেটা কী ভাই? বলবিনে আমাদের?"

"মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে!"

"ও তো সব খবরের কাগজ।"

"আরে, এই নামগুলোই তো ওলটপালট করে দিয়েছি! উলটো দিক থেকে একটু এদিক-ওদিক করে পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ, বঙ্গবাসী, স্টেটসম্যান আর ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া।....."

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

পৃথিবীতে সুখ নেই

হেডমাস্টারমশাই রোলকল করে চলেছেন—"...থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন্..." টেন-এ এসে তিনি হোঁচট খেলেন।

"টেন? নম্বর টেন? আসেনি সমীর? আজও আসেনি সে?"

সমীরের পাশের বাড়ির ছেলে অশোক দাঁড়িয়ে বলল—"তার অসুখ করেছে সার।"

"অসুখ? সমীরের অসুখ?" হেডমাস্টার বিস্মিত হয়ে উঠলেন—"সে তো খুব হেলদি ছেলে। তার আবার কী অসুখ হল?"

"আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারব না।" অশোক ইতস্তত করে—"অপস্মার, না—কী।"

"অপস্মার? সে আবার কী ব্যারাম?" হেডমাস্টারমশায়ের বিস্ময় যার পর নাই।

"কী জানি সার। ওতো তা-ই বলল।" তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে অশোক একটা কৈফিয়ত দিতে যায়—"পরশুদিন একটা ষাঁড় ওকে তাড়া করেছিল, তা-ই থেকেই হয়েছে কি না, কে জানে।"

"ষাঁড় থেকে অপস্মার?" হেডমাস্টারমশাই ঘাড় নাড়ে—"সে আবার কী? আচ্ছা, আমাদের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখাব।"

পরের দিনও সমীর গরহাজির ফের। হেডমাস্টারমশায়ের ফার্স্ট পিরিয়ড; রোলকল করতে গিয়ে আবার তাঁর চোট লাগে—"টেন? নম্বর টেন? রোল নম্বর টেন? আজও—আসেনি সমীর?"

অশোক উত্তর যোগায়—"না সার। তার শরীর আজ আরও খারাপ।"

"ও হ্যাঁ! মনে পড়েছে! অপস্মার! ষাঁড়ের অপভ্রংশ না—কী! তুমিই কাল বলছিলে না?"

"না সার, আজ অন্য অসুখ।" মুখখানা কীরকম করে অশোক রাফখাতার একখানা পাতা বার করে। "টুকে এনেছি আমি সার! আজ হলীমক।" পত্রপাঠ জানায়।

"হলীমক? সে আবার কী?" হেডমাস্টারমশাই এবার তো ঘাবড়েই যান—"সে আবার কী অসুখ—অ্যাঁ? হোলিখেলার থেকে কিছু হয়েছে নাকি ওর?"

"আমিও তো তা-ই ওকে জিজ্ঞেস করতে গেছলাম। ও বললে—'সে তুই বুঝবিনে রে। হলীমক ভারি শক্ত ব্যারাম। হোলির সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই এর। ও একটা কোবরেজি অসুখ।' " বিরসমুখে অশোক বিবৃতি দেয়।

"কোবরেজি অসুখ? আমাদের ডাক্তারকে যেতে বলব আজ তা হলে ওদের বাড়ি।" হেডমাস্টারমশায়ের ভাবনা হয়—"কিন্তু কোবরেজি অসুখ কি ডাক্তারি ওষুধে সারবে? আমি নিজেই একবার যাব না হয়।"

"যাবেন সার। নিশ্চয়ই যাবেন। ও ভারি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে!" অশোক জানাল।

সমীরের অসুখ নিয়ে সারা ইস্কুলে সোরগোল পড়ে গেল বেজায়। এমনকি মাস্টারদের মধ্যেও। ফোর্থক্লাসে ভরতি হয়ে এই ফার্স্ট ক্লাসে ওঠা অবধি একটি দিনের জন্যেও তার কোনো অসুখ করেনি, একদিনও তার ইস্কুল-কামাই নেইকো। রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্সের প্রাইজ পরপর তিন বছর একা সমীরই মেরেছে। সেই সমীরেরই উপর্যুপরি তিন-তিনদিন কামাই! অসুখের অজুহাত করে—সমীরের মতো ছেলের গাফিলতি! ভাবতেই পারা যায় না যে!

সমীর সে-ধরনের ছেলেই নয় যে! যতই দশটার দিকে কাঁটা এগোয়, ততই তার গায় কাঁটা দিতে থাকে, কেমন যেন মাথা ধরে ওঠে, আর পেট কামড়াতে লেগে যায়। ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি আর ডিপথেরিয়া সব হৈচৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে—সে-ধরনের ছেলেই সে নয়। অসুখের ছুতোনাতা করে একটা বাঁধা প্রাইজ—একচেটেই তার—এমন হাতধরা বাৎসরিক পুরস্কার একখানা—সে যে এত সহজে হাতছাড়া করবে, সে-ছেলেই নয় সে।

"হল কী তবে সমীরের?" ড্রিলমাস্টার হেডমাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করলেন। বলতে কি, সমীর-বিহনে তাঁরও মন খারাপ, ড্রিল করানোর উৎসাহই নেইকো আর। সমীরের ড্রিল ছিল একটা দেখবার মতো। তার অ্যাটেনশান, তার অ্যাবাউট-টার্ন, তার ফলইন—সে যে কী জিনিস, না দেখলে বোঝা যায় না। এমন এক মিলিটারি কায়দা যে, দেখলেই চমক লাগে; এমনকি ড্রিলমাস্টারমশাই নিজেই এক-একবার চমকে যান। বয়স্কাউট-দলের সমীরই তো ছিল আদর্শ। সেই সমীরেরই এ কী কাণ্ড!

সমীরের অভাবে ড্রিলমাস্টারের ড্রিলের কোনো উদ্দীপনাই আসছে না আদৌ। সমীরের ফলইন ছাড়া সমস্তই যেন বিফল!

"হোলি হায়, না—কী-যেন এক বিদঘুটে ব্যারাম হয়েছে তার, অশোক বলল আমায়।" গম্ভীরমুখে প্রকাশ করছেন হেডমাস্টার : "কাল বিকেলে দেখতে যাব আমি, যদি কালকেও সে না আসে!"

তার পরদিন সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সেই সমীরই বটে—কিন্তু অশোক যা বলেছিল তার চেয়েও বেশি—তার ডবল ম্রিয়মাণ।

হেডমাস্টারমশাই তাকে দেখে রোলকল বন্ধ রেখেই বললেন—"এই যে সমীর! এসেছ আজ! কী খবর বলো তো তোমার? হোলির হাঙ্গামাটাঙ্গামা চুকেছে সব?"

"না সার! হলীমক নয়। যা ভেবেছিলাম, তা নয়। আমার লক্ষণনির্ণয়ে ভুল হয়েছিল।" বিবর্ণমুখে সমীর বিবৃত করে—"খুব সম্ভব এটা আমার পাণ্ডুরোগ; কিংবা গুল্মও হতে পারে পেটে।"

পাশে অশোক ফিসফাস করে—"কোন গুল্ম? লতাগুল্ম নাকি রে? পাদপ নয় তো? পেট ফুঁড়ে তোর গাছ বেরবে? পা দিয়ে না মাথা দিয়ে?" সবিস্ময়ে জানতে চায় সে।

"সে তুই বুঝবিনে! শক্ত কোবরেজি অসুখ।" সমীরের কণ্ঠস্বরে গম্ভীর বিষণ্ণতা।

"এক কাজ করো।" হেডমাস্টারমশাই বলেন—"ডাক্তারবাবুকে বলে রেখেছি। যেয়ো তাঁর কাছে। তিনি ভালো করে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন।"

সেদিন বিকেলেই ড্রিলমাস্টার এসে জানালেন—"নাঃ সমীরের গতিক সুবিধের না। সে-সমীর আর নেই সার। ড্রিল করতে গিয়ে তার পা-ই ওঠে না আর। বলে যে—কী যেন বললে—কী নাকি হয়েছে তার পায়ে!" বলে কোনোরকমে তিনি দুঃখের কথাটা উচ্চারণ করলেন।

"শ্লীপদ?" হেডমাস্টারমশাই হকচকিয়ে যান—"তবে যে বলল—গুল্ম নাকি? এর মধ্যেই—এই কঘণ্টার মধ্যেই—অসুখ আবার বদলে গেল কীরকম?"

"কী করে বলব! সমীরই জানে!" বললেন ড্রিলমাস্টার।

"কী বলল সমীর?" হেডমাস্টার দুচোখ তাঁর কপালে তোলেন—"কী হয়েছে বললে? এর মধ্যেই আবার কী বিপদ হল তার?"

"শ্লীপদ, না—কী!" ড্রিলমাস্টারমশাই স্মরণশক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্ত করেন আবার—"বলছে যে—সার, বোধহয় আমার শ্লীপদ হয়েছ, কই, পা তেমন আর তুলতে পারছিনে তো!' "

"শ্লীপদ কী বস্তু?" বিশদরূপে জানতে চান হেডমাস্টারমশাই—"কী জাতীয় অসুখ?"

"কী করে জানব?" ড্রিলমাস্টারমশাই মুখ বেঁকান—"বলছে যে, শ্লীপদ কিংবা ধনুঃস্তম্ভ—এই দুটোর একটা-কিছু হবে বোধহয়। শুনে তো মশাই আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি!"

"এসব আবার কী ব্যামো? কোত্থেকে আসে?"

"কী করে জানব মশাই? পক্ষাঘাত হলেও বুঝতুম। ধনুষ্টঙ্কার হলেও বোঝা যেত।"

ড্রিলমাস্টার জানান—"আবার বলছে—এই শ্লীপদ থেকে শেষটায় নাকি গৃধ্রসীও দাঁড়াতে পারে! এইবলে ড্রিল ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে

সমীর। বসে আছে তখন থেকেই।" ড্রিলমাস্টার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন—"মুখ চুন করে এককোণে গিয়ে বসে রয়েছে! দেখে দেখে এমন বিচ্ছিরি লাগছে আমার!"

"কী সর্বনাশ! কী বললেন—গৃধিনী, না—ধ্রসি? যাকগে, তা হলে তো ওকে গাড়ি করে বাড়ি পাঠানো দরকার।" হেডমাস্টারমশাই তক্ষুনি ওকে ছুটি দিতে ব্যস্ত হন।

পরদিন সমীর ফের অ্যাবসেন্ট। আবার তার দেখা নেই!

অশোক বলল, রাফখাতার পাতা উলটে ভালো করে খতিয়ে দেখে সে বলল—"ওর অশ্মরী হয়েছে সার! পাছে আমার মাথায় না থাকে, তাই আমি খাতায় টুকে নিয়ে এসেছি।"

হেডমাস্টারমশাই এবার আর ভড়কান না; এমনই একটা বিজাতীয় কিছুর জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন মনে হয়। সহজেই ধাক্কাটা সামলে নেন তিনি—"অশ্মরী? কোনো অশ্ব-টশ্ব তাড়া করেছিল নাকি এবার?"

"কী করে জানব সার! আমিও তা-ই জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু, কিন্তু—কী বলব! আগে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে তেড়ে আসত, এখন কেবল মুখ কাঁচুমাচু করে চুপ করে থাকে, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আর বলে—'আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না রে!' "

"আমি মানে—সে।" অশোক আরও ভালো করে খোলসা করে—"আমি নিজে মরতে যাচ্ছিনে সার! সমীর যাচ্ছে! সে খালি বলছে সার—তোদের সঙ্গে এই আমার শেষ-দেখা হয়তো।"

"অশ্মরী? কস্মিনকালেও শুনিনি এমন। কোনো অমানুষিক ব্যাধি নিশ্চয়! মানুষের তো এসব রোগ হবার কথা নয়। অশ্ব-টশ্বরই হয়তো এসব হয়ে থাকে!"

"গাধাদেরও তো হয় না, যদ্দূর জানা গিয়েছে, কী বলেন সার?" অশোক জানতে চায়। "আমিও তো সেই কথাই বলেছি ওকে।"

"কী করে বলব! নামও শুনিনি কখনও। বিলিয়াস-ফিভার, কি বিলিয়ারি কলিক হলেও নাহয় বুঝতাম।" বলেন হেডমাস্টার—"এমনকি, মেনিনজাইটিস, ফেনিনজাইটিস, হুপিংকাফ, ব্রংকাইটিস—এসব হলেও কিছু-কিছুটা বোঝা যেত।"

ইস্কুল-ছুটির পর বাড়ি ফিরে অশোক সমীরের কাছে গেল। "এই যে, তুই এখনও বেঁচে রয়েছিস দেখছি! মরিসনি তো এখনও তা হলে?"

"না এখন পর্যন্ত না।" ম্লানমুখে সমীর জানায়।

"কেন? মরিস না কেন? এমন-সব তোর শক্ত-শক্ত ব্যামো! ভারী-ভারী উচ্চারণ! শুনে হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত উলটে পড়েছেন। কী হল তোর? মরিস না যে?" অশোক জবাবদিহি চায়।

"কী করে বলব!" সমীর বিষণ্ন সুরে বলে—"আমিও তো তা-ই ভাবছি।"

"ভেবেছিলাম এসে দেখব তুই মারা গেছিস।" অশোক ক্ষুণ্নকণ্ঠে প্রকাশ করে। তার স্বরে হতাশার সুর।

সমীর কিছু বলে না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে!

"আচ্ছা, মরলি কি না, কাল আবার এসে খোঁজ নেব!" অশোক নিজের মুখখানা যদ্দূর সম্ভব করুণ করে আনে—! "এখন খেলতে যাই? কেমন?"

পরদিন ক্লাসে সমীরকে দেখতে পেয়েই হেডমাস্টারমশাই উসকে উঠেন—"আজ—আজ আবার কী অসুখ তোমার? বিসূচিকা নয়তো?"

"অ্যাঁ? আজ্ঞে?" সমীর একটু চমকেই যায় বলতে কি!

"মানে, কলেরা-টলেরা হয়নি তো?" হেডমাস্টারমশায়ের ব্যাখ্যায় একবারে প্রাণ-জল-করা প্রাঞ্জলতা—"কলেরা আরও কঠিন হলে কোবরেজি হয়ে ওঠে কিনা! তখন বিসূচিকা হয়ে দাঁড়ায়—বিসূচিকা দাঁড়ালেই মারা পড়ে মানুষ, বাঁচে না আর।"

"বিসূচিকা বুঝি কিছুতেই সারে না সার?" জিজ্ঞেস করে অশোক।

"হ্যাঁ, সারে বইকী! সূচিকা দিয়ে নুন-জল ভরলে তবেই সারে। কিন্তু সে ভারি হ্যাঙ্গাম।" হেডমাস্টারমশাই জানান—"তার চেয়ে মারা যাওয়া ঢের সহজ। হ্যাঁ, ঢের-ঢের সোজা।"

"না সার! কোনো অসুখ না সার", সমীর জানাল—"আমি ডাক্তারবাবুর কাছে গেছলাম। তিনি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, আমার নাকি কোনো অসুখই হয়নি।" সমীর বলল, বেশ-একটু ক্ষুণ্নস্বরেই বলল।

"অসুখ হয়নি? যাক বাঁচা গেল!" হেডমাস্টারমশাই উছলে উঠলেন—"তবে আর কী! তবে তো ভালোই! খাও-দাও আর পড়াশুনা করো মন দিয়ে। আর হ্যাঁ, ড্রিল! ড্রিলটাও কোরো।"

"না সার, ভালো না। আমি নিজে বুঝতে পারছি—আমার শরীর ভালো নেইকো।" সমীর চিঁচিঁ করে।

"তোমার কিচ্ছু হয়নি সমীর! সত্যি কিছু হয়ে থাকলে ডাক্তারবাবু ধরতে পারতেন। এসব তোমার কাল্পনিক অসুখ। তুমি আমাদের ইস্কুলের আদর্শ ছেলে, তোমার কি এরকম সাজে কখনও?" হেডমাস্টারমশাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

তবুও সমীর কোনো প্রেরণা পায় না। কাতরদেহে সারা পৃথিবীর সমস্ত পীড়া বহন করে প্রপীড়িত সমীর মলিনমুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর সমীর—ইস্কুলের আদর্শ ছেলে সমীর উপরো-উপরি চারদিন ইস্কুল কমাই করল।

আর অশোক তার রাফখাতা উলটে পাতার পর পাতা পালটে চারদিনে চার রকমের অসুখের ফিরিস্তি দিল। শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত আর কামলা।

সেইসঙ্গে এ-ও জানাল যে, এই চারদিনেই তার হাড়-কখানা ছাড়া দেখবার মতো আর কিচ্ছুই নেই।

ড্রিলমাস্টার বললেন—"অগ্নিমান্দ্য হলেও বুঝতুম। কামলা আবার কী ব্যামো মশাই?"

"কানমলা দিলেই সারবে।" জানালেন হেডমাস্টার—"তবে মনে হচ্ছে, বেশ কষে মলা দরকার।"

সেই মতলবে হাত কষে রোষকষায়িত হয়ে সেদিন বিকেলেই সমীরের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন তিনি।

"সমীর বাড়ি আছ?" বলে একখানা বাজখাই ডাক ছাড়লেন। হেডমাস্টারি জাঁদরেল হাঁক।

"রয়েছি সার!" ও-র থেকে কাহিল-গলায় জবাব এল সমীরের—"এখনও রয়েছি সার!"

জীর্ণ-শীর্ণ সমীর কম্পিত-চরণে নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। শরীরে তার কিছুই নেই, এই গরমের দিনেও মোটা একটা কোট—সেই কোট ছাড়া আর কিছুই নেই তার শরীরে! আর তার কোটে একতাড়া কী যেন সব! দেখলে তাকে চেনাই যায় না সত্যি!

কান মলবেন কী, হাতই উঠল না তাঁর। হেডমাস্টারের মনে হল, ডাক্তারেরই ভুল, একটা-কোনো শক্ত অসুখ নিশ্চয়ই সমীরের হয়েছে—না হয়ে যায় না। না হলে তা হতে আর বাকি নেই।

"একী! কী হয়েছে তোমার?" তিনি আকাশ থেকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"কী যে হয়েছে, তা-ই তো ঠিক ধরতে পারছিনে সার! খুব যে শক্ত অসুখ, তার কোনো ভুল নেই আর, কিন্তু একটা তো অসুখ নয়—একসঙ্গে একশোটা আমাকে ধরেছে। আমি আর বাঁচব না সার!"

"আরে না-না, বাঁচবে বইকী! বাঁচবে বইকী! অসুখ হলে কি আর সারে না? সারবার জন্যেই তো অসুখ! শরীরটাকে আরও ভালো করে সারবার জন্যেও তো অসুখরা আসে।" হেডমাস্টারমশাই ওকে উৎসাহ দেন। "কী হয়েছে সব খুলে বলো তো তোমার?"

"কী হয়েছে, তা-ই তো জানিনে সার। আচ্ছা, আচ্ছা—" খানিক ইতস্তত করে সমীর অবশেষে প্রবাহিত হয়—"আচ্ছা, আমার কি অকালবার্ধক্য হতে পারে?"

"অকালবার্ধক্য? তোমার? এই বয়সে?" তবু একবার ওর আগাপাশতলা ভালো করে তাকিয়ে তিনি দেখে নেন। "অকালবার্ধক্য তোমার হতেই পারে না। অসম্ভব!"

"তা হলে কী যে হল, সেই তো এক মুশকিল!" সমীর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—"বাতরক্ত—না রক্তপিত্ত এর কোনটা যে—কী করে বলব! আচ্ছা সার, আমবাত

আর আমাশা কি একই ব্যাপার? ওরই একটা কিংবা দুটোই হয়তো একসঙ্গে আমার হয়ে থাকবে। তা কি কখনও হয় না?"

"কীরকম হয় বলো তো? পেট কামড়ায় খুব? মোচড় দিতে থাকে?"

"হয়তো দেয়, কিন্তু কিছুই টের পাই না।" সমীর জানায়—"তবে—তবে মনে হচ্ছে হয়তো সন্ন্যাস হওয়াও সম্ভব। আমার কি এ-বয়সে সন্ন্যাস হতে পারে না?"

"সন্ন্যাস? তা এমন আর অসম্ভব কী? শ্রীচৈতন্যের প্রায় এই বয়সেই তো হয়েছিল। কিন্তু এবার ম্যাট্রিক পাশ করবার বছর, এখন সন্ন্যাসের কথা ভাবছ কেন?"

"না সার, সে-সন্ন্যাস নয়। সন্ন্যাস-ব্যামো। হঠাৎ হয়—হলে মানুষ শ্রীচৈতন্য নয়, একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে কিন্তু সার, আজ কদিন ধরে আমার গলার ভেতরটা ভারি খুসখুস করছে, গলগ হয়েছে কি না, কে জানে! নাকি গোদ—নাকি আপনি বলেন অন্যকিছু? গলার ভেতর কি গোদ হয় না সার? গলগণ্ড কি বুঝি পিঠেই হয় কেবল? দিনরাত এইসব ভেবে ভেবেই আমি আরও কাহিল হয়ে পড়েছি। এতরকমের অসুখ আছে এই পৃথিবীতে—এত বিচ্ছিরি সব অসুখ! নাঃ, পৃথিবীতে আর সুখ নেই সার। চোখটাও কেমন যেন করকর করছে তখন থেকে।"

"চোখ? কেন চোখে আবার কী হল তোমার?"

"কতকিছুই তো হতে পারে! ইন্দ্রলুপ্ত হলেই-বা কে আটকাচ্ছে?"

"ইন্দ্রলুপ্ত? চোখে ইন্দ্রলুপ্ত?" হেডমাস্টারমশায়ের চোখে কপালে ওঠে—"আমার যদ্দূর ধারণা, চোখ যদিও একটা ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ই বটে, তবু চোখে কদাচ ইন্দ্রলুপ্ত হয় না, হতে পারে না, কারও কখনও হয়নি।"

"তা হলে ছানিই পড়ছে হয়তো!" সমীর করুণচক্ষে তাকায়।

"হ্যাঁ, সেটা বরং সম্ভব।" হেডমাস্টার সমর্থন করেন—"কিংবা চালশেও হতে পারে। আমার একবার হয়েছিল; কিন্তু তাতেই-বা হয়েছে কী? তার জন্যে অত ভাবছ কেন তুমি? অত ভয়ই-বা কিসের? ঘাবড়াবার কিছু নেই। ছানার মতো ছানিও তো কাটানো যায়!"

"চোখ কাটালে কি আর বাঁচব সার?" সমীরের দৃষ্টি আরও কাতর হয়ে আসে—"চোখ গেলে আর কী থাকবে আমার? সেইজন্যেই বুঝি কদিন ধরে খালি চোখের জল পড়ছে। সেইজন্যেই, নাকি? না—চোখের মধ্যে উদরী হয়েছে? আপনি কী বলেন?"

উদরীর উচ্চারণেই সমীরের উদরের দিকে হেডমাস্টারের নজর পড়ে।

"তোমার কোটের পকেটে উঁচু হয়ে রয়ে ওটা কী হে? টেলিফোন ডিরেক্টরি?" হেডমাস্টারমশাই হাতে নিয়ে দেখলেন—বইটার মলাটে বড়-বড়, মেজো-মেজো ছোট-ছোট হরফে লেখা—'শরীর সুস্থ রাখুন, পাঁচশত বিষম-ব্যাধির সরল কবিরাজি-চিকিৎসা। প্রথম সংস্করণ—সন ১২৯২ সাল। মূল্য মাত্র একমুদ্রা।'

"বুঝেছি।" হেডমাস্টারমশাই ঘাড় নাড়লেন—"কোনো পুরনো বইয়ের দোকান কি ফুটপাথ থেকে কিনেছ নিশ্চয়। এতক্ষণে তোমার সব ব্যারামের হদিশ পেলাম। আসল কারণ বোঝা গেল এখন। সমস্ত রহস্য পরিষ্কার এতক্ষণে। এ-বই আমি বাজেয়াপ্ত করলুম। আজ থেকে তোমার কোনো অসুখই নেই আর। বুঝেছ?" হেসে হেসে বললেন হেডমাস্টারমশাই—"তোমার সব অসুখ বেহাত হয়ে গেল—আমি হস্তগত করে নিয়ে চললুম! বুঝলে? যাও খেলোগে এখন—খেলাধুলো করোগে!"

সমীর বলল—"হ্যাঁ সার!" প্রকাণ্ড একটা ঘাড় নেড়ে বলল সে। মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে যেতেই ঘাড়টা যেন হালকা হয়ে গেছে তার।

আর তার পরেই—হেডমাস্টারমশায়ের অন্তর্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে খেলতে চলে গেল সে।

হেডমাস্টারমশাই ফেরবার পথে ড্রিলমাস্টারের বাড়ি গিয়ে চড়াও হলেন—সদ্যলব্ধ 'শরীর ভাল রাখুন' বইখানা বগলদাবাই করে।

"এই দেখুন মশাই, আপনার সমীরের যত অধিব্যাধি—এই দেখুন—এই আমার শ্রীহস্তে। দেখেছেন?"

"ও বাবা! এ যে খালি অসুখ! অসুখেই ভরতি! পাঁচশো রকমের ব্যামো দেখছি এখানে! নিদারুণ যত ব্যায়রাম অ্যাঁ?" ড্রিলমাস্টারের বাক্‌স্ফূর্তি লোপ পায়।

"হ্যাঁ, সমীরের শুধু দশটার ওপর দিয়েই গেছে। চারশো নব্বইটার বাকি ছিল এখনও—কিন্তু তাদের আক্রমণ থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি—এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছি সবকটাই!" হেডমাস্টারমশাই ড্রিলমাস্টারকে হাসতে হাসতে বলেন।

পরদিন প্রথম-ঘণ্টা পড়বার ঢের আগেই সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সারা ইস্কুলে কেবল দুজন সেদিন অনুপস্থিত। ড্রিলমাস্টারমশাই আর হেডমাস্টারমশাই! তাঁরা এখনও এসে পৌছোতে পারেননি এবং আসতে পারবেন না বলে খবর পাঠিয়েছেন!

ড্রিলমাস্টারমশায়ের পিত্তবিকার হয়েছে। পিত্তশূলও হতে পারে—এমনকি জ্বরাতিসার হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়! আর হেডমাস্টারমশায়ের—

কী হয়েছে ভেবে তিনি কূল পাচ্ছেন না। বিছানায় শুয়ে তিনি কুলকুল করে ঘামছেন—সেই সকাল থেকেই! সারাদিন কিচ্ছুটি খাননি, টি পর্যন্ত না, কেবল একবার বুকে, একবার পেটে, আরেকবার মাথায় নিজের মাথাতেই হাত বুলোচ্ছেন থেকে-থেকে।

হৃদরোগ কিংবা উদরাধান—দুটোর কোনো-একটা যে তাঁকে পেয়ে বসেছে সে-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। শিরঃশূলও হতে পারে।

খুব শক্ত অসুখ যে তার আর সন্দেহ কী?

সিট+আরাম = সিটারাম

আমি তখন বোর্ডিঙে থেকে ইস্কুলে পড়ি ফাস কেলাসে।

একদিন শীতের সকালে বোর্ডিঙের উঠোনে কয়েকজনে মিলে আরাম করে বসে রোদ পোহাচ্ছি, এমন সময়ে বোর্ডিঙের সামনে রেলের এক পারসেলভ্যান এসে হাজির। ভ্যান থেকে একটা লোক নেমে এসে খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করল—"সিটারাম চকরবর্তি বলে কেউ আছে এখানে?"

"না, সিটারাম কেউ নেই, তবে শিবরাম বলে একজন আছে বটে।" আমি বললাম।

"না, সিটারামকে চাই।"

কেন রে বাবা, ধরে নিয়ে যাবে নাকি? সেই সময়ে গান্ধীর আন্দোলনের হিড়িকে খুব ধরপাকড় চলছিল চারধারে। গান্ধীজির দলের বলে সন্দেহ হলে ধরে নিয়ে পুরে দিচ্ছিল জেলে। ভ্যানে চাপিয়ে সটান আমায় জেলখানায় নিয়ে যাবে নাকি? জেলখানায় আর পাহারোলায় আমার ভারি ভয়। পাছে ধরে জেলে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দেয় সেই ভয়ে গান্ধীজির ভলান্টিয়াররা যে-পথে হাঁটে আমি সেদিকে পা বাড়াইনে। ভয়ে ভয়ে শুধালাম—"কেন, কী দরকার সিটারামকে?"

"নেপাল থেকে রেলোয়ে পারসেল এসেছে তার নামে হোম-ডেলিভারির।"

"কিসের পারসেল?"

"তা আমি বলতে পারব না। কোনো প্রেজেন্ট হবে হয়তো।" লোকটা জানায়।

প্রেজেন্টের নাম শুনে আমার উৎসাহ জাগে। তখন ক্লাসের রেজিস্ট্রি খাতায় প্রেজেন্ট হওয়া ছাড়া আর কোনো প্রেজেন্ট আমার জীবনে নেই, তখনও আসেনি, তাই অপ্রত্যাশিত উপহারপ্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হলাম।

"সিটারাম নেই তবে শিবরাম একজন আছে বটে এখানে।" আমি জানালাম। "আমিই সেই ভদ্রলোক। আমাকে দেবে তোমার প্রেজেন্ট?"

"শিবরাম ছিলিস বটে, কিন্তু এখন তো তুই সিটারাম।" বলল আমার এক বন্ধু, "আরাম করে বসে আছিস তো এখন। sit plus আরাম is equal to সিটারাম।

"তা ছাড়া চক্রবর্তীতেও মিলে যাচ্ছে।" বলল আরেকজন—"ওরই নাম শিবরাম ওরফে সিটারাম চকরবর্তি, বুঝলে হে বাপু!"

"ওই হবে—ওতেই হবে।" বলে ভ্যানওয়ালা একটা রেলোয়ে রসিদের কাগজ আমার মুখের সামনে মেলে ধরল।—"আধঘণ্টা ধরে ঘুরে মরছি এই মহল্লায় তোমার খোঁজে। নাও, এখন দুটাকা দশ আনা বার করো, পারসেলের রেলের মাশুলটা দিয়ে তোমার মালের ডেলিভারি নাও।"

বলে সে ভ্যান থেকে উত্তমরূপে প্যাক-করা একটা পেল্লায় পারসেল এনে খাড়া করল উঠোনের ওপর। বলল—"নাও, চটপট খালাস করো—মালটা গন্ধ ছাড়ছে বেজায়।"

"গন্ধ বেরিয়েছে মালের? কিসের মাল গো?" আমরা সবাই জানতে চাই।

"মাংস। মণখানেক মাংস হবে। হরিণের মাংস বলে লেখা আছে পারসেলে। পচে গেছে মাংসটা।" সে বলে।

"পচা মাংস নিয়ে আমরা কী করব?" আমার উৎসাহ নিভে আসে।

"হরিণ তো পচিয়েই খায় মশাই!" সংক্ষেপে সে জানায়।

"নিয়ে নে নিয়ে নে।" আমার বন্ধুরা উৎসাহ দিতে থাকে—"আজ শনিবার তো। কালকে ছুটি! "রাত্তিরে খাসা ফিসটি হবে এখন।"

"দিনের পর দিন ঘাস-চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গেল। মুখ বদলানো যাবে আজকে।" বললে অন্যজন—"নিয়ে নে মাংসটা। আড়াই টাকায় এক মণ, সস্তাই তো রে!"

"আড়াই টাকা নয়, দুটাকা দশ আনা।" মনে করিয়ে দেয় লোকটা।

"ওই হল। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।"

দুটাকা দশ আনা খসিয়ে মাল তো খালাস করা গেল। তারপর আমরা পারসেলের পর্যবেক্ষণে লাগলাম। এই যৎসামান্য ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের কারও নামে এতবড় পারসেল আসতে দেখিনি কখনও।

"নেপাল থেকে পাঠিয়েছে।" পারসেলের গায়ের লেখা দেখে বলল একজন, "কী এক রানা নাকি। সে-ই পাঠিয়েছে।"

"রানা বলে আমার এক কাকা আছে, নেপালে চাকরি করে।" আমি জানাই : "তার সঙ্গে ভারি ভাব ছিল আমার। অনেকদিন তাকে দেখিনি। আমার ছোট কাকা।"

"তা হলে সে-ই হয়তো পাঠিয়েছে তোকে আদর করে।"

"এ তো দেখছি রানা জং বাহাদুর।" খুঁটিয়ে দেখে আমি বললাম : "আমার কাকা তো চকর্‌বর্‌তি হবে, সে বাহাদুর হতে যাবে কেন?"

"নেপালে যে যায় সে-ই বাহাদুর হয়।" ছেলেটা ব্যাখ্যা করে দেয় : "কিছুদিন থাকলেই নেপালি হয়ে যায় কিনা! যেমন আমাদের পশ্চিমা বন্ধুরা বাংলাদেশে থেকে বাঙালি বনে যায়, তেমনি। আর নেপালিমাত্রই বাহাদুর। হতে হবে!"

"নেপালে যাওয়াটাই একটা মস্ত বাহাদুরি।" আরেকজনার মন্তব্য।

"আর জং?" আমি জিজ্ঞেস করি। এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে জবর বলে বোধ হয়।

"বেশিদিন বাহাদুরি করলেই জং ধরে যায় মানুষের।" তার জবাব। "পুরোনো লোহায় যেমন মরচে পড়ে।"

এর ওপর আর কথা নেই। জবরজং যা ছিল, সব জলের মতন পরিষ্কার।

তারপর আমরা জং-ধরা সেই জেল্লাদার পারসেলের প্যাকিং ছাড়াতে লাগি। লোহার পাতগুলো কেটে ছাড়িয়ে ফেলে চাড়া দিয়ে পেরেকগুলো তুলে শক্ত পাতলা কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে আস্ত একটা হরিণের শবদেহ বেরিয়ে আসে।

"ওরে বাবা! এ যে অনেকখানি রে!" মাংসের চেহারা দেখে আঁতকে উঠতে হয় আমাদের।—"এত খাবে কে?"

"কেন, আমাদের হোস্টেলে রাক্ষস কি কম নাকি রে?"

"তা হলে মনিটারকে ডাকি? রান্নার ব্যবস্থা করা যাক।" রাক্ষসদের একজন উৎসাহ দেখায়, মনিটারকে ডাকতে যায়।

"আচ্ছা, মনিটারকে দিয়ে এটা হোস্টেলে গছিয়ে দিলে হয় না?" ...আমি বলি : "মানে, বেচে দিলে কী হয় হোস্টেলে? খাওয়াও হয়, আবার সেইসঙ্গে দুটো পয়সাও আসে। আমার কাকা যখন আমায় পাঠিয়েছে..."

"বা রে, খাচ্ছিস তো পেট ভরে! পয়সা চাচ্ছিস আবার?"

"সে তো সবাই খাচ্ছে—যাদের কাকা পাঠায়নি তারাও। আমার কাকার পাঠানোটা কি তা হলে ফাঁকা হয়ে যাবে?" আমি প্রকাশ করি। "তা ছাড়া, আমরা বামুনের ছেলে ভেবে দ্যাখ। খাওয়ার সঙ্গে আমাদের দক্ষিণে-টি চাই বাবা! আমি বরং কিছু লাভ নিয়ে মনিটারকে বেচে দিই। মনিটার আবার তার ওপর আরও কিছু বসিয়ে হোস্টেলকে ধসাক।" ছোটবেলার থেকেই ব্যবসাবুদ্ধিটা আমার বেশ প্রখর।

মনিটার আমাদের সঙ্গেই পড়ে। ফাস কেলাসের ছেলে এবং ফাস কেলাস ছেলে। পড়াশোনায় ভালো, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। বোর্ডিঙে ওর হাফ ফ্রি। হোস্টেলে আমাদের খবরদারি করা ওর কাজ। আমাদের খবরাখবর—মানে, কে পড়ছি না-পড়ছি, কী করছি না-করছি তার সব বার্তা হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কানে পৌঁছে দেয় সে।

মনিটার আসতেই আমি বললাম—"দ্যাখ যোগেন, এই আস্ত হরিণটা নেপালের থেকে আমার কাকা আমাকে উপহার পাঠিয়েছে।"

যোগেন দেখল। চোখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে। তারপর বলল—"বিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু!"

"হরিণ যে রে! হরিণ তো পচিয়েই খায়। জানিসনে?"

www.alorpathsala.org

"শুনেছি বটে। তা আমি এই মৃতদেহ নিয়ে কী করব এখন?" যোগেন শুধায় : "পোড়াতে হবে নাকি? কী করে হরিণের সৎকার করে শুনি?"

"অতিথিসৎকার করে।" বলল উৎসাহী একজন।—"এটা হোস্টেলে দিয়ে রাঁধিয়ে ফিসটি লাগা আজকে। আমাদের সবার সৎকার হয়ে যাক।"

"না না। এমনি দিয়ে নয়।" আমি বাধা দিয়ে বলি : "কিনে নিতে হবে। মণ-দেড়েক মাংস আছে। পনেরো টাকায় ছাড়তে পারি। তা হলেও হোস্টেলের লাভ, ভেবে দ্যাখ তুই। চার আনা করে সের পড়ল মোটে। চার আনায় কি মাংস পাওয়া যায়? তার ওপর হরিণের মাংস?" হরিণ দিয়ে ওকে কতটা আমার ঋণপাশে আবদ্ধ করেছি সেটা ভালো করে বোঝাবার জন্য আরও আমি প্রাঞ্জল হই—"হরিণ খেতে পাওয়া দূরে থাক, চোখে দেখতে পায় কটা লোকে? কীরকম লাল রঙের মাংসটা দেখেছিস? লাল মাংস দেখেছিস কখনও?"

বলতে গিয়ে লালসার উদাহরণস্বরূপ আমার মুখ দিয়ে লালা পড়ে যায়। সুরুৎ করে সেটাকে টেনে নিয়ে আমি বললাম—"তুই কিনে নে নাহয়। তারপর পনেরো টাকায় কিনে এর ওপর আরও কিছু লাভ চড়িয়ে পঁচিশ টাকায় বেচে দে নাহয় বোর্ডিংকে।" ওকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা পাই।

"হোস্টেল এই লাশ কিনতে যাবে কেন? হোস্টেলের কি খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই!" সে বলে।

"তা হলে তুইই এটা কিনে নিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে অমনি দিয়ে দে। প্রেজেন্ট করে দে নাহয়।"

"আমার লাভ?"

"তোর পনেরো টাকা এখন যাবে বটে, কিন্তু তেমনি মাস-মাস তিরিশ টাকা করে বেঁচে যাবে। হাফ ফ্রি তো তোর আছেই। তার ওপর সুপারিন্টেন্ডেন্ট খুশি হলে পুরো ফ্রি হয়ে যেতে কতক্ষণ? তা ছাড়া আরও একটা সুবিধা তুই করতে পারিস—"

"কী সুবিধা?"

"আরে, এই তো মোকা রে! পুরোনো হেডমাস্টার বদলি হয়ে নতুন হেডমাস্টার এসেছে ইস্কুলে কদিন হল। এখন যদি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে হোস্টেলে এনে খুব কষে খাওয়ানো যায় আর তিনি যদি জানতে পারেন—মানে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মশাই নিশ্চয়ই তাঁকে বলবেন তোর বাড়ির থেকে মাংসটা পাঠিয়েছে আর তুই সবাইকে ঘটা করে খাওয়াচ্ছিস—তা হলে চাইকি তাঁর দয়ায় ইস্কুল ফ্রিটাও হয়ে যাবে তোর।" আমি বিস্তারিত করি—"ভাই যোগেন, ডবোল গেন করবার এমন যো তুই ছাড়িসনে ভাই!"

যোগেন একটু চিন্তা করে। তারপর ছুট মারে সটান—"আমি সুপারিন্টেন্ডেন্ট মশাইকে ডেকে আনিগে।"

সুপরিন্টেন্ডেন্ট মশাই এসে দেখেন—"এ যে আস্ত একটা হরিণ দেখছি! চমৎকার! কোথ্থেকে এল?"

"যোগেনের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে সার।" ও যো পাবার আগেই আমি বলে দি। যোগেন, ছেলে হিসেবে যতই ভালো হোক, মনিটার হিসেবে আমাদের কাছে একটা ডেভিল। কিন্তু যখন পনেরো টাকা দিচ্ছে তখন তাকে তার due দিতে হবে বইকী।—"ও এটা আপনাকে উপহার দিতে চায়।" ডেভিলকে তার ডিউ দিয়ে আমার ডিউটি করলাম।

শুনে সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুখ লালসায় লাল হয়ে ওঠে—মাংসটার মতোই টকটকে। মুখ থেকে লালা ঠিক না পড়লেও লালায়িত হয়ে তিনি বললেন—"তা বেশ বেশ। অনেকখানি মাংস আছে এটার।"

"মণ দুয়েক তো হবেই সার।" যোগেন বলল।

সুপারের ভ্রূকুঞ্চিত হল, একটু যেন দোমনা দেখা গেল তাঁকে।—"না, দু'মণ নয়। তা, দু'মণ ঠিক না হলেও এক মণ তো বটেই।"

হরিণটাকে তিনি একমনে পর্যবেক্ষণ করলেন। "এখনই এটাকে পুঁতে ফেলার দরকার।" জানালেন তিনি। "গর্ত খোঁড়ো সবাই মিলে।"

"পুঁতে ফেলবেন?" শুনে আমরা দমে গেলাম। "পুঁতে ফেলবেন কেন সার?"

গোর দেওয়া তো পোড়ানোরই নামান্তর—আমার মনে হল। এইভাবে হরিণটার শেষকৃত্য করবার প্রস্তাব আমাদের মনঃপূত হয় না।

"তা, মাসখানেক তো পুঁতে রাখা দরকার। ভালো করে না পচলে হরিণের মাংস তেমন উপাদেয় হয় না নাকি।"

"এমনিতেই বেশ পচেছে সার। ক'দিন ধরে আসছে নেপাল থেকে। যা পচা গন্ধ ছেড়েছে! আবার কেন ওটাকে পুঁততে যাবেন?" যোগেন বলে।

"যথেষ্ট পূতিগন্ধ বেরিয়েছে সার।" আমি যোগ করি। "আর নয়!"

"তা বটে। গন্ধটা বেশ জবররকমের বটে।" বলে তিনি নাকে রুমালচাপা দিলেন—"তা যোগেন, তুমি এটা আমাকে উপহার দিতে যাচ্ছ কেন?"

"আপনাকে উপহার দেওয়া সার তার মানে আমাদের নিজেদেরই দেওয়া।" ওর হয়ে আমাকেই বলে দিতে হল আবার—"দেবতাকে যেমন পুজো দিয়ে প্রসাদ পায় মানুষ। আর, আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আরসব মাস্টারকেও আমাদের পুজো দেওয়া।" বলে, তারপরে হেড করে বলটাকে গোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে যাই "তা ছাড়া আমাদের নতুন হেডমাস্টারমশাই এসেছেন। যোগেন চায় যে, মানে আমরা সবাই চাই, আপনি আমাদের হয়ে হোস্টেলের ফিস্টে তাঁকে নেমন্তন্ন করুন।"

"তা হলে এই ভোজটা আমরা হেডমাস্টারমশাইয়ের সংবর্ধনা-উৎসব বলেই ঘোষণা করি-না কেন?" উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন। "মানে তাঁর জন্যেই আমাদের এই প্রীতিভোজ।"

"সে-ই তো আমরা বলতে চাইছি সার। শুধু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারছি না কেবল।" আমি বলি—"এই সুযোগে নতুন হেডসারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হবে। সেটা মধুরেণ সমাপয়েৎ করেই শুরু করা উচিত নয় কি? আপনিই বলুন সার?"

"তা হলে বেশ। কাল রবিবার ছুটির দিন আছে। কাল দুপুরের মধ্যাহ্নভোজে হেডমাস্টারমশাইকে হোস্টেলে নেমন্তন্ন করা যাক। সেইসঙ্গে আরসব টিচারকেও। কী বল?"

"হাঁ সার। শিবহীন যজ্ঞ যেমন হয় না তেমনি শিবের সঙ্গে আরসব—"

বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই। ভূতপ্রেত কথাটার উচ্চারণ করাটা ঠিক আমার অভিপ্রেত ছিল না।

"শিবের সঙ্গে আরসব দেবতাকেও আমাদের যজ্ঞস্থলে..."

যোগেন বলে। এতক্ষণে একটা যোগ্য কথাই বলে যোগেন।

"ডাকো ঠাকুরকে। হরিণের মাংস তো রোস্ট করে খেতে হয়। সে কি পারবে রোস্ট করতে? আস্ত রোস্ট করা দরকার।"

ঠাকুরকে ডেকে আনা হল। দেখেশুনে সে বলল—"রোস্ট করতে পারি তো। কিন্তু গোটা হরিণ ধরবে এত বড় হাঁড়ি পাব কোথায়! তার চেয়ে বড় বড় টুকরো করে হাণ্ডিকাবাব বানিয়ে নিই-না কেন? সেও খেতে খুব খাসা হবে বাবু।"

পরদিন দুপুরে সারি সারি পাতা পড়ল আমাদের খাবারঘরে। টিচাররা বসলেন, আমরাও বসলাম। হেডমাস্টারমশাই বসলেন মধ্যমণি হয়ে। পোলাও পড়ল পাতায় পাতায়। হাণ্ডিকাবাবের হাঁড়ি এসে নামল আমাদের সামনে। সৌরভে সারা ঘর মাত! পাতে-পাতে পড়তে লাগল বড় বড় টুকরো হরিণ-মাংসের। হেডমাস্টারমশাই একগাল কামড়ে বললেন—"বাহ্! বেশ খাসা হয়েছে তো!"

"আরও খাসা হত যদি আরও কিছুদিন পচতে পেত।" বললেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

"তা তেমন না পচলেও সুপাচ্য হবে আমি আশা করি সার।" আমার নিজস্ব মত।

"আমিও একদিন খাওয়াব আপনাদের হরিণের মাংস।" হাসিমুখে বললেন হেডসার : "নেপালের এক রানার ছেলে আমার ছাত্র ছিল। সে একটা হরিণ আমায় রেল-পারসেল করে পাঠাবে বলে লিখেছে। দুচার হপ্তার মধ্যেই এসে পড়বে মাংসটা। খেয়ে দেখবেন তখন। নেপালের হরিণ খেতে আরও কত খাসা হয় দেখবেন তখন।"

শুনে আমার টনক নড়ল। হাত আর নড়ল না। পাতের মাংস পাতেই পড়ে রইল। অতিকষ্টে একআধটু চাখলাম। আঁচানোর পরে যোগেনকে শুধালাম আড়ালে—"নতুন হেডসারের নাম কী রে? জানিস নাকি।"

"তোদের চক্রবর্তীই তো রে!" যোগেন জানায় : "শ্রীযুক্তবাবু সীতারাম চক্রবর্তী। এম.এ, বি.এ.-বি.টি। বাড়ি খানপুর।"

শুনে আমার চারধার খাঁখাঁ করে, মুহূর্তের মধ্যে সব যেন খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে আমার সামনে। পরদিন খুব ভোরে কাকচিল ডাকবার আগেই উঠে আমি হোস্টেল ছেড়ে পালালাম। ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে সটান গান্ধীজির ভলান্টিয়ার দলে নাম লেখালাম গিয়ে। এখন জেলে গেলেই আমার বাঁচন।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কঙ্কেকাশির কাণ্ড

প্রফুল্ল গোড়া থেকেই গোমড়া মেরে আছে। হ্যাঁ, ভারি তো কাজ! তার জন্যে আবার কঙ্কেকাশিকে তার ল্যাজে বেঁধে দেওয়া। হোন-না গে তিনি একজন নামজাদা ডিটেকটিভ (প্রফুল্ল শুনেছিল কোরিয়া অঞ্চলে কঙ্কেকাশির মতো এতবড় গোয়েন্দা নাকি আর নেই!) তবু এই সামান্য একটা মশা-মারার ব্যাপারে অমন ভারী কামান কাঁধে বয়ে আনতে প্রফুল্ল'র আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সত্যি, কামাস্কাটকা থেকে উনি না এলেও এমন কিছু আটকাত না।

বোম্বের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর এক কোণের টেবিলে কঙ্কেকাশির মুখোমুখি বসে গুম হয়ে এই সব কথাই সে ভাবছিল প্রফুল্ল। সামনে চপ-কাটলেট-ডিভিল-ডিম-কেক-পুডিং-এর সমারোহ সত্ত্বেও তার জিভ সরছিল না। বাস্তবিক, এই মূর্তিমান কোরিয়ার সম্মুখে কী করে কিছু মুখে তোলার উৎসাহ হয়! এত বড় অপমান হজম করবার পর খেতে কারু রুচি থাকে? প্রফুল্ল তাই বিষণ্ন।

কিন্তু মি. কঙ্কেকাশি বেপরোয়া। ডিশের পর ডিশ তিনি সাবড়ে চলেছেন—কাঁটা-চামচের কামাই নেই তাঁর। এক ফাঁকে সামনের যুবকটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। একী! কঙ্কেকাশি একটু বিস্মিত হন। একজন খুনে একটার পর একটা দশটা খুন করেছে, নিজের চোখেই এরকম দৃশ্য তাঁর জীবনে একাধিকবার দেখেছেন কিন্তু বিস্মিত হতে পারেননি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দশ-দশটা প্লেটের সামনে একেবারে নির্বিকার! একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথটি হয়ে বসে আছেন, একটাকেও কাবু করতে পারছেন না! তাঁর সুদীর্ঘ জীবনস্মৃতির মধ্যে এবম্বিধ কাণ্ড তাঁর স্মরণে পড়ে না।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। কঙ্কেকাশির বিরাট বপু-পরিধির তুমুলে আন্দোলন (অবশ্য খাবার সময়েই যেটা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়) অকস্মাৎ থেমে যায়; মাছের চোখের মতন ড্যাবড্যাবে চোখ প্রসারিত হয় ঈষৎ। তিনি প্রশ্ন করেন, 'প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্লতর হবার পক্ষে কী বাধা হচ্ছে, জানতে পারি কি?'

বাংলাতেই প্রশ্ন করেন। সোজা, পরিষ্কার বাংলাতেই। কামাস্কাটকার লোক হলে কী হবে, বাংলা, হিন্দি, উড়ে (এবং কোনো কোনো জানোয়ারের ভাষাও) ভালোভাবেই আয়ত্ত। তবে কামাস্কাটকার ভাষায় তাঁর দখল আছে কি না বলা

যায় না। এ বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষক হবার সাহস তার নেই। কেননা সে নিজেও কামস্কাশিয়ানে অজ্ঞ, দারুণ অজ্ঞই।

প্রফুল্ল আরো বেশি গম্ভীর হয়ে যায়; মাথা চুলকোতে চুলকোতে জবাব দেয়, 'ভাবনায় মশাই, ভাবনায়। কীরকম গুরুদায়িত্ব মাথার ওপরে, বুঝতেই তো পারছেন।'

'বুঝতে পারছি বৈকি!' কঙ্কেকাশি ঘাড় নাড়েন, 'মি. ব্যানার্জির কবে এসে ভারতবর্ষে পৌছবার কথা, অথচ তিনি কী এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে গেছেন। আসতে পারলেন না। তাঁর সই করা নমিনেশন পেপার এয়ার মেল-এ কাল বিকেলে বোম্বে পৌছেছে; তাঁর এ্যাটর্নি গলস্টোন কোম্পানির আপিসের জিম্মায় রয়েছে। সেই নমিনেশন পেপার আজই সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ছুটতে হবে আমাদের। তবে আঠারো তারিখের আগে সেই নমিনেশন পেপার যথাস্থলে ফাইল হতে পারবে। আঠারোই হচ্ছে ফাইলিং-এর শেষ দিন। তা না হলে মি. ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না।'

'বিলেতে মি. ব্যানার্জির আকস্মিক দুর্ঘটনার মূলে কি কোনো রহস্যজনক কারণ আছে বলে আপনি আশঙ্কা করেন?' প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করে।

কঙ্কেকাশি এর জবাব দেন না। 'এই নমিনেশন পেপার ডাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। কোনো কারণে একদিন কিম্বা কয়েক ঘণ্টা লেট হলেই সবকিছু পণ্ড—তার চেয়েও বড় আশঙ্কা হচ্ছে নমিনেশন পেপার মারা যাবার।'

'মারা যাবার?' প্রফুল্লর চোখ প্রকাণ্ড হয়, কেন, নমিনেশন পেপার মেরে কার কী লাভ? ওটা কী একটা মার্তব্য জিনিস?'

'হ্যাঁ, ডাকে পাঠালে, এমনকি রেজেস্ট্রি করে ইনসিওর করে পাঠালেও যথাস্থানে যথাসময়ে যথাযথ জিনিসটা পৌছবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কার কী লাভ আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? বাংলাদেশে দুটি দল আছে তা 'জানেন আপনি?'

'উঁহুঁ,' প্রফুল্ল বলে, 'জানি না তো!'

'এই দুটি দলই কাউন্সিলে ঢুকতে চায়। দু দলে ভীষণ রেষারেষি। কাউন্সিলে যে-দল ভারী হতে পারবে তাদেরই সারা বাংলায় আধিপত্য হবে কিনা। একটি দলের নাম হচ্ছে ফু-ফুকস-ফ্যান, যারা ইনফুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খ্যালে আর ফ্যানের তলায় হাওয়া খায় তারা মিলেই এই দল গড়েছে, আমেরিকার বিখ্যাত ক্লু-ক্লুকস-ক্ল্যানের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, একমাত্র নামের কতকটা শামিল ছাড়া।'

'বটে!' প্রফুল্লের নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না!—'আরেকটা দল কারা?'

মি. ব্যানার্জি হচ্ছেন এই 'ফু-ফুকস-ফ্যান'-এর পাণ্ডা। অন্য দলের নাম হচ্ছে 'বাই হুক আর ক্রুক'। এই 'বাই হুক আর ক্রুক' পার্টির নেতা হচ্ছেন মি. সরকার। যেমন করেই হোক নিজেদের মতলব হাসিল করতে এঁরা সিদ্ধহস্ত।"

'আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সরকারি চালে মি. ব্যানার্জি বিলেতে আটকা পড়েছেন?'

'আপাতত আমি কোণের ঐ লোকটার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।' কঙ্কেকাশি চোখ টিপে ইশারা করেন।

এতক্ষণে কঙ্কেকাশির ওপরে প্রফুল্লর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। সত্যি, অনেক কিছু খবর রাখেন তো ভদ্রলোক! এইজন্যে তাঁর দিক থেকে সহসা 'তুমি' সম্বোধনেও সে অপ্রসন্ন হতে পারে না, কঙ্কেকাশির ইঙ্গিতের অনুসরণ করে সে তাকায়।

'ঐ যে—ঐ কাঠখোট্টা গোছের চেহারা, মাথার চুল ক্রপ করা, চোখে কুটিল ভঙ্গি। ঐ কোণের ছোট্ট টেবিলটায় বসে কাটলেটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে—ওকে লক্ষ করো। সহজেই বুঝতে পারবে এ-রকম ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁয় গতিবিধি ওর স্বভাবসিদ্ধ নয়। কাঁটা-চামচের কসরতে এখনও পোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্যের সঙ্গে কাটাকাটি নয়, হাতাহাতিতেই ও পরিপক্ব। ও এখানে এসেছে তোমার অনুসরণ করে।'

'আমার?' প্রফুল্লর বিশ্বাস হয় না, 'তার মানে?'

'একটু কায়দা করে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, চোখ কাটলেটের দিকে থাকলেও ঝোঁক ওর আমাদের দিকেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত চিজ উনি—ওর মতন কৌশলী এবং ভয়লেশহীন ভদ্রবেশী গুণ্ডা দুটি আছে কি না সন্দেহ। ঐ শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলতে পারে, কিন্তু এ দেশে দুর্লভ। মি. ব্যানার্জির পার্টি আমাকে যে তোমার সঙ্গে দিয়েছেন, উনিই হচ্ছেন তার একমাত্র কারণ।'

প্রফুল্লর সহজে বাকস্ফূর্তি হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে,—'ওর নাম?'

'ওর নাম হচ্ছে সমাদ্দার, ওরফে সমরেশ ঠাকুর, ওরফে গোলাপ হাজরা, ওরফে টেশ্বর রায়, ওরফে পোড়া গণেশ, ওরফে আরো এক ডজন। প্রেসিডেন্সি জেল আর হরিণবাড়ি-ফেরতা। আমার সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়—অনেকটা হৃদ্যতার সম্বন্ধই বলতে পার। এই কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ও একটু সংকোচ বোধ করছে, নইলে এতক্ষণে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।'

প্রফুল্ল চমকে ওঠে। 'বলেন কী মশাই?'

'ওই রকমই। কঙ্কেকাশি যৎসামান্যই হাসেন। 'সরকারের দল ওকে লাগিয়েছে তোমার পেছনে, ব্যানার্জির নমিনেশন পেপার নিয়ে তুমি যথাসময়ে আগে যথাস্থানে যাতে পৌঁছতে না পার সেইজন্যেই। এজন্যে তোমাকে খুন করতেও পেছপা হবে না। তবে, কৌশলে কাজ উদ্ধার

করতেই ও ভালোবাসে—খুনোখুনি করতে ততটা পক্ষপাতী নয়। এ বিষয়ে একটু সুরুচিই আছে বলতে হয় লোকটার।'

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হতে পারে না, 'আপনি কেন ওকে অ্যারেস্ট করছেন না তাহলে? গ্রেপ্তার করে ফেলুন! এক্ষুনি-এই দণ্ডে!

'দণ্ডমুণ্ডের মালিক কি আমি? তা ছাড়া এখন পর্যন্ত ও কোনো অপরাধ করেনি, কেবল মনের মধ্যে এঁচেছে মাত্র; আর মনে-আঁচার জন্যেই যদি গ্রেপ্তার করা শুরু করতে হয় তাহলে এত লোককে ধরতে হয় যে জেলখানায় তার জায়গা কুলোবে কি না সন্দেহ। কেবল মনের মধ্যেকার প্ল্যানের জন্যে কাউকে তো জেলে পোরা যায় না।'

'তাহলে—তাহলে তো ভারি মুশকিল!' প্রফুল্ল ভীতই হয়; বলে 'আমাকে খুন করে ফেলবে তবে?'

'যদি করেই ফ্যালে, তখন—হ্যাঁ, ওকে ধরে ফেলতে আমার বিলম্ব হবে না, যদি নিতান্তই না পালিয়ে যায়। তবে, সমাদ্দারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতারই সম্পর্ক। আমাকে দেখে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তোমাকে একেবারে খতম করবে না আমি আশা করি। এত ভয় কিসের তোমার?'।

বিশেষ ভরসাও পায় না প্রফুল্ল।

'এইজন্যেই বলেছিলাম, ভয়ানক গুরুদায়িত্ব তোমার মাথায়। যদি নমিনেশন পেপার নিয়ে আঠারোই এগারোটার মধ্যে কলকাতায় না পৌঁছতে পার তাহলে ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না—তার সঙ্গে সঙ্গে তার পার্টিরও দফা রফা। মি. সরকারের দলেরই একছত্র আধিপত্য হবে কাউন্সিলে, মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও দখল করে বসবেন তাঁরাই। সামান্য একখানা সই-করা কাগজের ওপরে একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে ভেবে দেখ। এবং যে-সে পার্টি নয়, ফু-ফুকস-ফ্যান।'

'অর্থাৎ আপনার ভাষায়, যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খ্যালে—ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এদের দলের কেউ নই। বিন্দু-বিসর্গও জানি না। আমাকে এই মারাত্মক কাজে পাঠাবার মানে?' প্রফুল্ল বিরক্তি প্রকাশ না করে পারে না।

তার মানে, তুমি যে-আপিসের কেরানি তার বড়কর্তা ঐ দলের একজন হোমরা চোমরা। তিনি তো ফ্যানের হাওয়া খান, তা হলেই হল। এসব কাজে অজ্ঞ এবং আনাড়িকে পাঠানোই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত, নাড়িজ্ঞানওয়ালা লোক অনায়াসেই অন্য দলের ঘুষ খেয়ে—বুঝতেই পারছ! তা ছাড়া, ওদের বিশ্বাস আছে তোমার ওপর। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওপর দেওয়ার তার প্রমাণ হয় না কি?'

'আমার গায়েও যথেষ্ট জোর।' প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাসল কনট্রোল করে কঙ্কেকাশিকে দেখায়। 'সহজে যে কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে তা প্রাণ থাকতে নয়।

'এসো, সমাদ্দারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই'—কল্কেকাশি প্রফুল্লকে আহ্বান করেন, 'কী ছুতোয় যে গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে তা-ই ভেবে কাহিল হয়ে উঠেছে বেচারা।'

'ওর সঙ্গে আলাপ!' দারুণ বিস্মিত হয় প্রফুল্ল, 'বলেন কী আপনি?'

'ক্ষতি কী তাতে? গিলে ফেলবে না তোমায়।' কল্কেকাশি প্রফুল্লকে টেনে নিয়েই চলেন, 'এই যে সমাদ্দার! অনেক দিন পরে দেখা, কেমন, ভালো আছ তো?'

সমাদ্দার চমকে ওঠে, 'মি. কল্কেকাশি যে! এখানে এখন এই ভাবে আপনাকে দেখতে পাব আশা করিনি।'

'আমি কিন্তু আশা করেছিলাম। পরশু সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে একই বোম্বে মেল-এ যখন উঠতে দেখলাম তোমাকে।'

'বটে?' সমাদ্দার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, 'আপনারা তাহলে আজ সকালেই বোম্বে এসে পৌঁছেছেন? উনি আপনার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ, এই একটু আগে নেমেই এই রেস্তোরাঁতেই প্রাতরাশের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে—হ্যাঁ, কী জিজ্ঞেস করেছিলে? ইনি? ইনি হচ্ছেন প্রফুল্লকুমার রায়,—কেন যে এঁর বোম্বে আগমন তা তো তোমার ভালোমতোই জানা আছে ভাই সমাদ্দার!

'আমার?' সমাদ্দার থতমত খায়, 'না তো! আমি কী করে জানব? তবে, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে বিশেষ আপ্যায়িত হব অবশ্যই।'

'তা তো বটেই! হবার কথাই! বেশ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু প্রফুল্লবাবু, আর ইনি হচ্ছেন মি. সমাদ্দার, আমার বন্ধু। অন্তত আমার শত্রু নন। এঁর পরিচয় তো টেবিলে বসেই তোমাকে দিয়েছি! প্রফুল্লবাবু কলকাতার এক সদাগরি আপিসে চাকরি করেন। প্রফুল্ল, তুমি সমাদ্দারমশাইকে নমস্কার করলে না? প্রথম পরিচয়ে নমস্কার করাই তো ভদ্র রীতি।'

প্রফুল্ল আর সমাদ্দার বোকার মতো পরস্পরকে প্রতিনমস্কার করে। 'সুখী হলাম, প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলাপিত হয়ে।' সমাদ্দার জানাল।

'হবেই তো।' 'কল্কেকাশি যোগ করেন, 'নিশ্চয়। এইজন্যেই কি কলকাতা থেকে এতটা পথ কষ্ট করে তোমাকে আসতে হয়নি? বলো? ভাগ্যিস আমি ছিলাম এখানে! বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে কখনওই পেছপা নই বলেই তোমাদের আলাপ করিয়ে দিলাম।'

'সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মি. কল্কেকাশি!' সমাদ্দার বিস্ময়ের ভান করে, 'কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি বলছ?' কল্কেকাশি আকাশ থেকে পড়েন, 'আমার সঙ্গে তুমি জোচ্চুরি করবে একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

'সত্যি, আপনার কথার কিছু আমি বুঝতে পারছি না। এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিওর চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।'

'তাই নাকি? তবু তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কথাগুলো কাজে লাগবে। এখান থেকে প্রফুল্লবাবু যাবেন গলস্টোন কোম্পানির অফিসে। সেখানে তাঁর কী যেন কাজ আছে। আমি অবশ্য ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি না। আরেকটা জরুরি খবর, আমরা উঠেছি তাজমহল হোটেলে। তারপর, রাত্রের গাড়িতেই আমরা ফিরছি কলকাতায়। আচ্ছা, এখন আসা যাক, হোটেলেই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হচ্ছে আশা করি?'

হতভম্ব সমাদ্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বেরিয়ে আসে। প্রফুল্ল অসন্তোষ প্রকাশ করে—'মি. কঙ্কেকাশি! আপনি একজন বড় গোয়েন্দা হতে পারেন—'

'উঁহু, উঁহু, আদৌ না! এই বরাতের জোরেই যা করে খাচ্ছি ভাই!'

'কিন্তু আপনি কি অনেক গুপ্ত খবর ওকে দিয়ে দিলেন না?'

'কাকে? সমাদ্দারকে?' কঙ্কেকাশি অবাক হন, 'কী রকম?'

'এই—আমার গলস্টোন অফিসে যাবার খবর? এবং তাজমহল হোটেলে আমাদের ওঠার কথা? তারপর আজ রাত্রে কলকাতা-মেলে ফেরা—'

'কেন, কী হয়েছে তাতে? ওর কত কষ্ট লাঘব হয়ে গেল। বেচারাকে এসব খুঁজে বের করতে আর হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।

'সেটা কি ভালো হল খুব?' প্রফুল্ল বিরক্তি চাপতে পারে না।

'আহা! বুঝতে পারছ না? যতই ওকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে, ততই বেশি ও ভাববার সময় পাবে। আর যতই ও ভাবতে পাবে, ততই নিজের কাজ মাটি করবে, সব ওর গুবলেট হয়ে যাবে, তা জানো?'

অতঃপর প্রফুল্ল কঙ্কেকাশির কাছে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে। একটু পরেই আর একখানা ট্যাক্সি প্রফুল্লর গাড়ির পিছু নেয়—এই ট্যাক্সি সমাদ্দারের। পরমুহূর্তেই আরও একখানা গাড়ি দূর থেকে, দুজনের অনুসরণ করে চলে—এ গাড়িতে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত কঙ্কেকাশি মহাশয়।

তিনখানা গাড়ি অনেক ঘুরে-ফিরে শহরের উপকণ্ঠে হাজির হয়—চারধারে বাগান-ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ফটকে। গলস্টোন কোম্পানির বড়সাহেবের রেসিডেন্স। প্রফুল্লর গাড়ি ফটকের ভেতর ঢোকে। একটু দূরে সমাদ্দারের গাড়ি থামে—কঙ্কেকাশির গাড়ি দ্বিতীয় গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন থেমে যায়।

'সমাদ্দার মশাইকে এখানে এ অবস্থায় দেখব আশা করতে পারিনি।' কঙ্কেকাশি বলেন। তাঁর মুচকি হাসিটিও লক্ষ করবার।

'এই, একটু শহর দেখতেই বেরিয়েছি।' সমাদ্দার থতমত খায়, 'হাওয়া খেতেও বটে!'

'শহর দেখতে শহরের বাইরে? মন্দ নয়! ফিল্ম অভিনেতার কাজটা তোমার পাকা তাহলে!' কঙ্কেকাশি গলা পরিষ্কার করেন, 'আমিও তাই-ই আঁচ করেছিলাম, যাচাই করে নিতেই এতদূর এলাম। যাক আমার কাজ আছে। শহরেই ফিরলাম আমি।' তারপর একটু থামেন, 'হ্যাঁ, হয়তো তোমার জানা আছে, তবু খবরটা তোমাকে দিয়ে রাখাই ভালো। ঐ বাড়িটাই মি. গলস্টোনের—ব্যানার্জির নমিনেশনের কাগজপত্র আনতে প্রফুল্লবাবু ওখানেই গেছেন। দ্যাখো চেষ্টা করে—যদি তোমার বরাত খুলে যায়! বন্ধু-বান্ধবের ভালো চাওয়াই আমার দস্তুর, জানোই তো!'

কঙ্কেকাশি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেন। যে পথে এসেছিলেন সেই দিকেই ফিরে চলেন। সমাদ্দার কোনো জবাব দিতে পারে না।

তার পরেও আরেক ঘণ্টা সমাদ্দারকে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে প্রফুল্লর গাড়ি বাইরে বেরোয়। সমাদ্দারের আবার অনুসরণ। প্রফুল্লর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাজমহল হোটেলের সামনে। সমাদ্দারেরও। প্রফুল্ল নেমেই, ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা চুকিয়ে সটান তেরো নম্বর ঘরে ঢুকেই খিল আঁটে। সমাদ্দার গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কিসের যেন বন্দোবস্ত করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কঙ্কেকাশির অভ্যুদয় হতেই প্রফুল্ল রুদ্ধনিঃশ্বাসে ছুটে যায়—'সর্বনাশ হয়েছে, মি. কঙ্কেকাশি!'

কঙ্কেকাশি বিন্দু মাত্র বিচলিত হন না—'কী সর্বনাশ?'

'সমাদ্দার এসে উঠেছে এখানে! আমাদের পাশে বারো নম্বর ঘরে!

'তাই নাকি? তাহলে তো ওকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে! আমিও ওর শুভাগমন আশা করছিলাম।'

কঙ্কেকাশি রসিকতা করছেন প্রথমটা প্রফুল্ল তা-ই ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই ডিনারের টেবিলে সমাদ্দারের পাশে বসে নিজের চক্ষু-কর্ণকে ওর বিশ্বাস করতে হল। ওর চিরকালের ধারণা, গোয়েন্দায় আর দুশমনে মুখোমুখি হলেই ঝটাপটি বেধে যায়। শেষোক্তরা স্বভাবতই পলায়ন তৎপর এবং প্রথমোক্তরা সর্বদাই ওদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যতিব্যস্ত। মাসিকপত্রের পাতায় আর গোয়েন্দা-গ্রন্থমালার বইয়ে পড়ে পড়ে এইরকমের একটা বিশ্বাস ওর বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এখন ওদের পরস্পরকে অন্তরঙ্গের মতো কথাবার্তা কইতে দেখে তার সে ধারণা দস্তুরমতোই টলে গেল!

মধ্যাহ্নভোজ প্রফুল্লর মাথায় উঠে গেল, সে মাঝে মাঝে তার কোটের বুকপকেটে হাত দিয়ে গুরুতর বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। যে কাগজের টুকরোটির ওপর একটা পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে সে যত্নের সঙ্গে

কোটের ভেতরের লাইনিঙের মধ্যে সেলাই করে রেখেছে। গলস্টোন সাহেবের সেই বাড়িতে বসেই। জিনিসটার সেখান থেকে অকস্মাৎ উড়ে যাবার কথা নয় কিছুতেই, তবু সাক্ষাৎ সমাদ্দার ওরফে উপেন্দ্রনাথের সমীপে বসে বারবার পরীক্ষার দ্বারা সে নিজেকেই যেন ভরসা দিতে চাচ্ছিল।

ওর হস্তচালনা কঙ্কেকাশির নজর এড়িয়ে যায় না। তিনি হাসতে থাকেন—'ভয় নেই প্রফুল্লবাবু! বস্তুটি নিরাপদেই আছে, এবং থাকবেও, যদি-না নিতান্তই তোমার কোট তুমি খোয়াও।'

কঙ্কেকাশির কথায় প্রফুল্লর ভারি রাগ হয়, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। কঙ্কেকাশি তা বুঝতে পারেন।

'আমি কি কোনো গুপ্তকথা ফাঁস করে দিলাম নাকি? মোটেই না প্রফুল্লবাবু! সমাদ্দার জানত যে কোথায় তুমি নমিনেশন পেপারটা রেখেছ।—কিহে সমাদ্দার, জানতে না?'

সমাদ্দার সহাস্য মুখে ঘাড় নাড়ে—'নিশ্চয়! কোটের লাইনিং, ঐখানেই তো রাখবার জায়গা। দরকারি জিনিস সকলে ঐখানেই রাখে আর সেটা সকলেই জানে।'

গোয়েন্দা এবং বদমাইশ দুজনে মিলে অকপটে হাসতে থাকে। প্রফুল্ল ভারি মুষড়ে পড়ে। হতে পারে কোটের লাইনিংই মূল্যবান কাগজপত্র রাখবার মামুলি জায়গা এবং তা সকলেই জানে, তবু কী দরকার ছিল কঙ্কেকাশির সমাদ্দারকে এই খবরটা দেবার? বরং যাতে সমাদ্দারের মনে এরকম সন্দেহ না জাগে বা জেগে থাকলেও তা দূর হয় সেই চেষ্টা করাই কি তাঁর উচিত ছিল না? কঙ্কেকাশির গোয়েন্দাপনায় সে ঘাবড়ে যায় সত্যিই।

যাক, প্রফুল্লর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। যতক্ষণ সে জেগে আছে ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কারও ক্ষমতার বাইরে—এবং রাত্রে, রেলগাড়িতে, হয় সে গা থেকে কোট খুলবেই না, আর খোলেও যদি, তাহলে বালিশের মতোই সেটাকে ব্যবহার করবে, সে ঠিক করে রাখল। তার ঘুম ভারি সজাগ, তার মাথার তলা থেকে কোট সরায় কার সাধ্য?

খাওয়া শেষ হলে কঙ্কেকাশি বলেন—'এসো সমাদ্দার, একটু দাবা খেলা যাক। প্রফুল্ল জানো নাকি দাবা খেলা?'

'জানি সামান্যই।' প্রফুল্ল মুখ গোঁজ করে বলে।

'আমার আপত্তি নেই।' সমাদ্দার উত্তর দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা খুব জমে ওঠে! কঙ্কেকাশি ও সমাদ্দারের তো ভালোই জানা আছে, প্রফুল্লও নেহাত কম যায় না। ক্রমশই ওর উৎসাহ বাড়তে থাকে, সমাদ্দারের চাল কেড়ে নিয়ে নিজে চাল দেয়। প্রফুল্ল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ওর গরম বোধ হয়, সে কোট খুলে ফ্যালে—সমাদ্দারের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওর কোনো

হুঁশই নেই তখন। সমাদ্দারও নিজের কোট খুলে প্রফুল্লর কোটের পাশেই রাখে। খেলা চলতে থাকে।

খানিক বাদে সমাদ্দার উঠে পড়ে—'প্রফুল্লবাবু, আপনি ততক্ষণ মি. কঙ্কেকাশির সঙ্গে খেলুন। আমি আসছি এক্ষুনি।'

একটু পরেই সমাদ্দার ফিরে আসে—'প্রফুল্লবাবু, ভুল করে নিজের কোট ফেলে আপনার কোট নিয়ে গেছি, কিছু মনে করবেন না!' কোট খুলতে খুলতে সে বলে।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে নিজের কোট কেড়ে নেয়। যেখানে নমিনেশন পেপার ছিল সেখানটা অনুভব করে। পরমুহূর্তেই সে সমাদ্দারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কঙ্কেকাশি মাঝে পড়ে বাধা না দিলে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বদমাশটাকে এই দণ্ডেই সে টুঁটি টিপে খুন করে বসত হয়তো-বা।

'প্রফুল্লবাবু, করছ কী? কী ব্যাপার?'

'ওই চোর—'

'আহা, গালাগালি কেন? কী হয়েছে শুনি-না?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না! এই লোকটা এইমাত্র আমার কোট থেকে নমিনেশন পেপার চুরি করেছে।'

কঙ্কেকাশি তেমনিই অবিচলিত থাকেন—'তাই নাকি হে সমাদ্দার? তা-ই নাকি?'

'প্রফুল্লবাবু তো সেই রকমই ভাবছেন!' সমাদ্দার বলে, 'কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কখন যে তা করলুম।'

সমাদ্দার উচ্চহাস্য করে, কঙ্কেকাশিও হাসতে থাকেন। প্রফুল্ল রেগে আগুন হয়ে ওঠে, কিন্তু একা সে কী করবে? আপনমনেই জ্বলতে থাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন কেমন ঠ্যাকে যেন। সমাদ্দার ও কঙ্কেকাশির মধ্যে যে রকম অন্তরঙ্গতা তাতে ওর মনে নিদারুণ সন্দেহ হতে থাকে। ওরা দুজনে মাসতুতো ভাই নয় তো?

'তুমি যদি এখুনি আমার কাগজ না ফিরিয়ে দাও, তোমার হাড় ভেঙে আমি ছাতু করব!' প্রফুল্ল ঘুষি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়।

'আহা, হচ্ছে কী এসব। মারামারি করাটা কি ভদ্রলোকের কাজ?' কঙ্কেকাশি ওকে সামলাতে যান।

'আপনি থামুন মশায়! আপনারা দুজনেই এক গোত্র! আমি বেশ বুঝেছি। গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু—সে যাক। আপনার কোনো কথা আমি শুনছি না আর!' প্রফুল্ল মরিয়া হয়ে ওঠে।

এবার সমাদ্দার কথা বলে—'আপনি যদি আমার গায়ে হাত দেন প্রফুল্লবাবু, তাহলে আমি এক্ষুনি হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আপনাকে পুলিশে দেব। আপনার কাগজ যে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কী?'

'বেশ, আমি তোমাকে সার্চ করব! দেখব তোমার কামরাও!'

'স্বচ্ছন্দে। এক্ষুনি।' সমাদ্দার কল্কেকাশির দিকে ফেরে, 'আপনিও কি সার্চ করতে চান নাকি? আসুন আমার সঙ্গে, দুজনেই আসুন, কোনো আপত্তি নেই আমার!'

'বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না আমি', কল্কেকাশি একটা সিগারেট ধরান। 'তুমি যদি সত্যই ও-কাগজ নিয়ে থাক সমাদ্দার, তাহলে এখন তোমাকে সার্চ করে কোনোই লাভ নেই। কোথায় তুমি তা রেখেছ তা যদি ভেবে বার করতে পারি, তাহলে তা পেতে আমার বেশি বিলম্ব হবে না।'

'আপনি কি তাহলে সার্চ করতে প্রস্তুত নন?' প্রফুল্ল এবার ক্ষেপে ওঠে।

'উঁহু!' কল্কেকাশির সংক্ষিপ্ত জবাব! 'আপাতত না।'

'বেশ, আমি নিজেই করব তাহলে।'

প্রফুল্ল সমাদ্দারের ঘরে যায়, ওর আপাদমস্তক অনুসন্ধান করে, জুতোর সুকতলাও বাদ দেয় না। সবগুলো জামার ভেতরের-বাইরের সমস্ত পকেট হাতড়ায়, কোটের যাবতীয় লাইনিং পরীক্ষা করে; ঘরের আঁতিপাঁতি আনাচকানাচ সব জায়গায় ওর তল্লাশি চালায়। অবশেষে মুহ্যমানের মতো যখন নিজের কামরায় ফেরে তখন কল্কেকাশি জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মুখ না ফিরিয়েই তিনি বলেন—'তখনই বললাম, প্রফুল্লবাবু! এখন ওকে সার্চ করে কোনো ফলই হবে না। কোথায় ও জিনিসটা সরিয়েছে যতক্ষণ তা-ই না আঁচ করতে পারছি—'

সমাদ্দার ফিরতেই কল্কেকাশির কথায় বাধা পড়ে। প্রফুল্ল কোনো জবাব দেয় না। নিজের মধ্যে সে যেন নেই তখন, এতটাই সে দমে গেছে।

'তবে সত্যি বলতে কী, দোষ তোমার নিজেরই প্রফুল্লবাবু! তুমিই বলো, তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি?' কল্কেকাশি তাঁর কথাটা শেষ করেন।

কিন্তু এ-কথায় প্রফুল্লের এখন আর সান্ত্বনা কোথায়? সে গুম হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কল্কেকাশি সমাদ্দারকে বলেন—'ভারি দমিয়ে দিয়েছ তুমি বেচারাকে! ওর মুখ দেখলে মায়া হয়!'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে। স্বভাবতই সে কোমলহৃদয়, সত্যি সত্যিই দুঃখ হয় তার। 'বিজনেস ইজ বিজনেস, মিস্টার কল্কেকাশি।' সে বলে।

'সে কথা হাজারবার। কিন্তু ভেবে দ্যাখো দিকি কী সর্বনাশটা হল ওর। হয়তো চাকরিই থাকবে না আর। ও তো ভেঙে পড়েছেই, আমিও খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না।' কল্কেকাশি সমাদ্দারের চোখের ওপর চোখ রাখেন—'কাগজখানা রাখলে কোথায় হে সমাদ্দার?'

সমাদ্দার হাসে—'আমি যে রেখেছি আমি তো তা স্বীকারই করিনি।'

'না। এবং তোমাকে স্বীকার করতে বলছিও না। কিন্তু এ কথাও ঠিক, ও-কাগজ নিয়ে তুমি সটকাতে পারছ না। হাওড়ায় নেমে আমি তোমাকে আটকাব এবং খানাতল্লাশি করব—যাকে বলে পুলিশের খানাতল্লাশি।'

সমাদ্দার আতঙ্কিত হয়। 'সেটা কি সঙ্গত হবে মি. কল্কেকাশি? কাগজখানা যে আমার কাছে আছে তার তো আপনি বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাননি।'

'না পাই। কিন্তু কাগজখানা আমি পেতে চাই।'

কল্কেকাশির সংকল্প শুনে সমাদ্দারের শঙ্কা হয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যায়, গিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেক ভেবে সে একটা উপায় ঠাওরায়। ঘরের দরজায় খিল আঁটে। তারপর নিজের সুটকেস বার করে এক কোণের একটা গুপ্ত বোতাম টেপে, তার ফলে ডালার দিকে একটা লুকানো খুপরি খুলে যায়। তার ভেতর থেকে সদ্য-অপহৃত নমিনেশন পেপারটা বেরিয়ে পড়ে।

সমাদ্দার কাগজটা পরীক্ষা করে। সেই সঙ্গে আরেকখানা অনুরূপ নমিনেশন পেপারও। দ্বিতীয় কাগজখানা ফাঁকা। এখানা তাকে দেওয়া হয়েছিল আসল কাগজ চেনার সুবিধার জন্য। সমাদ্দার দ্বিতীয় কাগজের যথাস্থানে প্রথম কাগজের দেখাদেখি ব্যানার্জির সই নকল করে বসিয়ে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই কাগজ, হুবহু একই সই, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই এ সইটা যে জাল করা তা স্পষ্টই ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে জাল কাগজখানা গুপ্ত ডালার মধ্যে এঁটে রেখে, আসল কাগজটা একখানা লেফাফায় ভরে। খামের উপরে লেখে মি. সরকারের নাম আর ঠিকানা। কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে, রেজেস্ট্রি করে পাঠানোই সমীচীন মনে করে। ডাকে গেলেও তার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছবে এবং একেবারে তার নিয়োগকর্তার কাছেই, সুতরাং তার অসুবিধে হবার কিছু নেই। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে, কাছাকাছি পোস্টঅফিসের উদ্দেশে সে রওনা হয়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢোকে। আপনমনেই বলে যেন, 'দরজায় তালা লাগিয়ে সমাদ্দারকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'তাই নাকি?' কল্কেকাশি সিগারেটের সামান্য অবশেষটা ফেলে দিয়ে উঠে বসেন, 'তাহলে তো ওর ঘরটা একবার তল্লাশ করতে হয়। এই তো সেরা সুযোগ।'

সব-খোল চাবির সাহায্যে সহজেই তালা খুলে যায়। সবিস্ময় প্রফুল্লকে নিয়ে তিনি সমাদ্দারের ঘরে ঢোকেন।

'কোথায় কোথায় তুমি খুঁজেছিলে?'

তদুত্তরে প্রফুল্ল তার অনুসন্ধান-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে।

'এই সুটকেসটা দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। ওর ভেতরেও দেখছি। ওতে নেই।'

'দেখেছ ঠিকই, কিন্তু আরেকবার দেখা যাক।'

কল্কেকাশি সুটকেসটাকে উন্মুক্ত করেন, ভেতরের যা কিছু জিনিসপত্র সব তাঁর পায়ের কাছে উজাড় হয়।

'দেখলেন তো! বললাম ওতে নেই!' প্রফুল্ল বলে।

কল্কেকাশি ওর কথায় কান দেন না। খুঁজতে খুঁজতে সেই গুপ্ত বোতাম আবিষ্কৃত হয়। 'পেয়েছি প্রফুল্লবাবু, এতক্ষণে পেয়েছি।'

'কী?'

'এই দ্যাখো।' চাবি টিপতেই সেই লুকোনো ডালা প্রকাশ পায়। আর, তার মধ্যে একটা লম্বা লেফাফা। লেফাফাটা না খুলেই তিনি প্রফুল্লর হাতে তুলে দেন। 'এই নাও। কিন্তু সাবধান, আর যেন না খোয়া যায়।'

প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে। কাগজখানা দেখেই সে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দু'হাতে কল্কেকাশির একখানা হাত চেপে ধরে—'আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে মাফ করুন—'

উত্তরে কল্কেকাশির শুধু অল্প হাসি দেখা যায়। ব্যাগের জিনিসপত্তর যথাযথ রেখে তেমনি তালা এঁটে তারা বেরিয়ে আসেন আবার।

সমাদ্দার হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই, তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে কল্কেকাশির কাছে। 'এটা কি ভালো হল আপনাদের মশাই? আমার অবর্তমানে আমার ঘরে ঢুকে সুটকেস খুলে—'

কল্কেকাশি বাধা দেন—'আমরাই যে তোমার ঘরে ঢুকেছি, সুটকেস খুলেছি তার কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ? প্রমাণ ছাড়া তুমি তো চল না সমাদ্দার!'

প্রফুল্ল এতক্ষণে মন খুলে হাসতে পারে।

সমাদ্দার গজরাতে থাকে, ভয়ানক রাগের ভান করে; কিন্তু সেও মনে মনে হাসে।

আর মি. কল্কেকাশি? তাঁর মুখে কোনো হাসি দেখা যায় না কিন্তু।

সমাদ্দার চলে গেলে প্রফুল্ল মুখ খোলে—'একবার বাগাতে পেরেছে, আর পারবে না। এ-কোট আমি আর গা থেকে খুলছি না। রাত্রেও নয়।'

'ঠেকে শেখা ভয়ানক শেখা প্রফুল্লবাবু।' কল্কেকাশি ঘাড় নাড়েন, 'এবং একবারই এই শিক্ষা একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আচ্ছা মি. কল্কেকাশি, সুটকেসটার যে একটা গোপন খুপরি আছে, কী করে আপনি তা বুঝলেন?'

'তোমার কোটের লাইনিং আছে যেমন করে সমাদ্দার বুঝেছিল।' কল্কেকাশি ব্যাখ্যা করে দেন—'ও থাকতেই হবে। তোমার কি ডিটেকটিভ উপন্যাস-টুপন্যাস একেবারেই পড়া নেই প্রফুল্লবাবু?'

প্রফুল্ল নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে লজ্জা পায়। একেবারেই যে এক-আধখানা ওর পড়া নেই তা নয়, তবু সে সসংকোচেই বলে—'এবার থেকে পড়ব কিন্তু। নিশ্চয় পড়ব।'

'আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন!' সমাদ্দার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'সরকারদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেছ তো?' কল্কেকাশি জিজ্ঞাসা করেন।

'হ্যাঁ, কালই দিয়েছে। নগদ পাঁচটি হাজার।' সমাদ্দার উত্তর দেয়, 'কেন, কী হয়েছে তাঁর?'

'না, এমন কিছু না।' কল্কেকাশি তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকান। 'এখন দশটা; আর এক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্সি কোর্টে নমিনেশন পেপার সব দাখিল করা হবে কিনা! তোমাকে আমি কেটে পড়ার জন্যই বলতে এলাম। বন্ধুভাবেই বলতে এসেছি অবশ্যি বলাই বাহুল্য।'

'কেটে পড়ব? আমি? কেন?' সমাদ্দার সচকিত হয়।

সরকারদের পার্টির কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছ সেই জন্যে। ওদের হাতে খুনে গুণ্ডা তো নেহাত কম নেই, যাদের তুলনায় তুমি তো আস্ত একটি দেবদূত।'

'ফাঁকি দিয়েছি কী রকম?' সমাদ্দার এবার, হাসে আপনি কি তা হলে এখনও বুঝতে পারেননি, মিস্টার কল্কেকাশি, আমার সুটকেস থেকে যে কাগজ আপনি বের করে নিয়েছিলেন তা আসলে জাল-সই করা?

'আগাগোড়াই তা আমি জানতাম।' কল্কেকাশির গলার স্বর গম্ভীর।

'তবে?'

'আসলে একটা কথা তুমি নিজেই এখনও বুঝতে পারনি, সমাদ্দার! প্রফুল্লর পকেট থেকে যে কাগজ তুমি বাগিয়েছিলে, সেটাও জাল ছাড়া কিছু নয়।'

'অ্যাঁ?' এবার সত্যিই চমকে ওঠে সমাদ্দার। 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়! যে-সময়ে তুমি বাগানবাড়ির গেটে প্রফুল্লর জন্যে অপেক্ষা করছিলে, সেই সময়ে আমি শহরে ফিরে গলস্টোন কোম্পানির আপিস থেকে আসল কাগজখানা হস্তগত করি। স্টেশনে নেমেই গলস্টোন সাহেবকে ফোন করে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম, যাতে সাহেবের বাড়ি থেকে প্রফুল্লকে একখানা নকল

নমিনেশন পেপার দেওয়া হয়—যাক, এখন সব বুঝতে পারছ তো? যাতে তোমার নজর একেবারেই আমার দিকে না পড়ে, সেইজন্যই আমার এত কাণ্ড করা। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং সব কিছু। অমন মূল্যবান কাগজ আমি নিতান্ত অবহেলাভরে আমার এই কোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছি, ইচ্ছেমতন জামা খুলেছি; আমিই রেখেছি যে, তা তুমি জানতে পারনি ঘুণাক্ষরেও। প্রফুল্লও তা জানে না। কোনোদিন জানবেও না। যাক, বেচারা আনন্দেই রয়েছে, ওর মাইনে বেড়ে গেছে খবর পেলাম—'

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আমার সম্পাদক শিকার

হাম কিংবা টাইফয়েড, সর্পাঘাত কিম্বা মোটরচাপা, জলে ডোবা কিংবা গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, এগজামিনে ফেল করা কিংবা কাঁকড়া-বিছে কামড়ানো—জন্মাবার পর এর কোনোটা-না-কোনোটা কারু-না-কারু বরাতে কখনও-না-কখনও একবার ঘটেই। অবশ্য যে মোটরচাপা পড়ে তার সর্পাঘাত হওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার, সে রকম আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই হয়, এবং যার সর্পাঘাত হয় তাকে আর গাছ থেকে পড়তে হয় না। যে ব্যক্তি জলে ডুবে যায় মোটরচাপা পড়ার সুযোগ তার যৎসামান্যই এবং উঁচু দেখে গাছ থেকে ভালো করে পড়তে পারলে তার আর জলে ডোবার ভয় থাকে না। তবে কাঁকড়া-বিছের কামড়ের পরেও এগজামিনে ফেল করা সম্ভব, এবং অন্য ক্ষেত্রে হামের ধাক্কা সামলাবার পরেও টাইফয়েড হতে দেখা গেছে। হামেশাই দেখা যায়।

কিন্তু বলেছিই, এসব কারু-না-কারু অদৃষ্টে ঘটে কখনও বা কদাচ। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা প্রায় সবারই জীবনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনিবার্যরূপে প্রকট হয়, তার ব্যতিক্রম খুব বড় একটা দেখা যায় না। আমি গোঁফ ওঠার কথা বলছিনে—তার চেয়েও শক্ত ব্যারাম—গোঁফ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হবার প্রেরণা মানুষকে পেয়ে বসে।

আমারও তা-ই হয়েছিল। প্রথম গল্প লেখার সূত্রপাতেই আমার ধারণা হয়ে গেল আমি দোলগোবিন্দবাবুর মতো লিখতে পেরেছি। দোলগোবিন্দকে আমি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ মনে করতাম—কেননা একই কাগজে দুজনের নাম একই টাইপে ছাপার অক্ষরে দেখেছিলাম আমি। এমনকি অনেক সময়ে দোলগোবিন্দকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় লেখক বলে আমার বিবেচনা হয়েছে—তাঁর লেখা কেমন জলের মতো বোঝা যায়, অথচ বোঝার মতন মাথায় চাপে না। কেন যে তিনি নোবেল প্রাইজের জন্য চেষ্টা করেন না, সেই গোঁফ ওঠার প্রাক্কালে অনেকবার আমি আন্দোলন করেছি—অবিশ্যি মনে মনে। এখন বুঝতে পারছি পণ্ডিচেরি, কিংবা পাশাপাশি, রাঁচিতে তাঁর পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না বলেই। আরও দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের লেখা এখনও চোখে পড়ে থাকে কিন্তু কোনো কাগজপত্রেই দোলগোবিন্দবাবুর আর দেখা পাই না।

যা-ই হোক, গল্পটা লিখেই বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে, দোলগোবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের রচনার ঠিক পাশেই সেটা প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। নিশ্চিন্তে বসে আছি যে নিশ্চয়ই ছাপা হবে এবং ছাপার অক্ষরে লেখাটা দেখে কেবল আমি কেন, রবীন্দ্রনাথ, এমনকি স্বয়ং দোলগোবিন্দ পর্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠবেন—ও হরি! পর-পর তিন মাস হবার পরে একদিন দেখি বুকপোস্টের ছদ্মবেশে লেখাটা আমার কাছেই আবার ফিরে এসেছে। ভারি মর্মাহত হলাম—বলাই বাহুল্য! শোচনীয়তা আরও বেশি এই জন্যে যে তিনমাসে তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম—খতিয়ে দেখলাম সেই দেড়টা টাকাই ব্যাটাদের লাভ।

তারপর, একে-একে আর যে-কটা নামজাদা মাসিক ছিল সবাইকেই যাচাই করা হল,—কিন্তু ফল একই। আট আনা দামের পেটমোটাদের ছেড়ে ছ-আনার কাগজদের ধরলাম—অবশেষে চার আনার নব্যপন্থীদেরও বাজিয়ে দেখা গেল, নাঃ, সব শেয়ালের একই রা!—হ্যাঁ, গল্পটা ভালোই, তবে ছাপতে তাঁরা অক্ষম। আরে বাপ, এতর অক্ষমতা যে কেন তা তো আমি বুঝতে পারিনে, যখন এত লেখাই অনায়াসে ছাপতে পারছ তোমরা! মাসিক থেকে পাক্ষিক—পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে নামলাম; অগত্যা লেখাটার দারুণ অমর্যাদা ঘটছে জেনেও দৈনিক সংবাদপত্রেই প্রকাশের জন্য পাঠালাম। কিন্তু সেখান থেকেও ফেরত এল। দৈনিকে নাকি অতবড় 'সংবাদ' ধরবার জায়গাই নেই। আশ্চর্য! এত আজেবাজে বিজ্ঞাপন—যা কেউ পড়ে না—তার জন্য জায়গা আছে, আর আমার বেলাই যত স্থানাভাব? বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে ছাপলেই তো হয়! কিন্তু অদ্ভুত এঁদের একগুঁয়েমি—সব সংবাদপত্র থেকেই বারম্বার সেই একই দুঃসংবাদ পাওয়া গেল।

তখন বিরক্ত হয়ে, শহর ছেড়ে মফঃস্বলের দিকে লক্ষ্য দিতে হল—অর্থাৎ লেখাটা দিগ্বিদিকে পাঠাতে শুরু করলাম। 'মেদিনীপুর-মন্থন', 'চুঁচূড়া-চন্দ্রিকা', 'বাঁকুড়া-হরকরা', 'ফরিদপুর-সমাচার', 'গৌহাটি-গবাক্ষ', 'মালদহের গৌড়বান্ধব'—কারুকেই বাদ রাখলাম না। কিন্তু শহুরে পেটমোটাদের কাছ থেকে যে দুর্ব্যবহার পাওয়া গেছে, পাড়াগেঁয়ে ছিটে-ফোঁটাদের কাছে তার রকমফের হল না। আমার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক দারুণ ষড়যন্ত্র আমার সন্দেহ হতে লাগল।

এইভাবে সেই প্রথম ও পুরোবর্তী আমার একমাত্র লেখার ওপরে 'ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেন' পলিসির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতেই বাংলা মুলুকের তাবৎ কাগজ—আর সাড়ে তিন বছর গড়িয়ে গেল—বাকি রইল কেবল একখানি কাগজ—কৃষি-সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক। চাষাড়ে কাগজ বলেই ওর দিকে এতাবৎ আমি মনোযোগ দিইনি, তারা কি আমার সাহিত্য-রচনার মূল্য বুঝবে? ফেরত তো দেবেই, হয়তো সঙ্গে সঙ্গে বলে পাঠাবে: 'মশাই, আপনার আষাঢ়ে গল্প আমাদের কাগজে অচল; তার চেয়ে ফুলকপির চাষ সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো বক্তব্য থাকে তা লিখে পাঠালে বরং আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতে পারি।'

www.alorpathsala.org

এই ভয়েই এতদিন ওধারে তাকাইনি—কিন্তু এখন আর আমার ভয় কী? (ডুবন্ত লোক কি কুটো ধরতে ভয় করে?) কিন্তু না, ওদের কাছে আর ডাকে পাঠানো নয়, অনেক ডাকখরচা গেছে অ্যাদ্দিন, এবার লেখা-সমভিব্যাহারে আমি নিজেই যাব।

'দেখুন, আপনি—আপনিই সম্পাদক, না? আমি—আমি একটা—একটা লেখা এনেছিলাম আমি—!' উক্ত সম্পাদকের সামনে হাজির হয়ে হাঁক পাড়লাম।

গম্ভীর ভদ্রলোক চশমার ফাঁকে কটাক্ষপাত করলেন—'কই দেখি!'

'একটা গল্প। একেবারে নতুন ধরনের—আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন।' লেখাটা বাড়িয়ে দিলাম—'আনকোরা প্লটে, আনকোরা স্টাইলে একেবারে—'

ভদ্রলোক গল্পে মনোযোগ দিয়েছেন দেখে আমি বাক্যযোগ স্থগিত রাখলাম। একটু পড়তেই সম্পাদকের কপাল কুঞ্চিত হল, তারপরে ঠোঁট বেঁকে গেল, নাক সিঁটকাল, দাড়িতে হাত পড়ল—যতই তিনি এগুতে লাগলেন, ততই তাঁর চোখমুখের চেহারা বদলাতে লাগল। অবশেষে পড়া শেষ করে যখন তিনি আমার দিকে তাকালেন তখন মনে হল তিনি যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন। হতেই হবে! কী রকম লেখা একখান!

'হ্যাঁ পড়ে দেখলাম—নিতান্ত মন্দ হয়নি। তবে, এটা যে একটা গল্প তা জানা গেল আপনি গল্পের নামের পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে কথাটা লিখে দিয়েছেন বলে—নতুবা বোঝার আর কোনো উপায় ছিল না।'

'তা বটে। আপনারা সম্পাদকরা যদি ছাপেন তবেই নতুন লেখক আমরা উৎসাহ পাই।' বলতে বলতে আমি গলে গেলাম : 'এ গল্পটা আপনার ভালো লেগেছে তাহলে?'

'লেগেছে একরকম। তা এটা কি—'

'হ্যাঁ, অনায়াসে। আপনার কাগজের জন্যেই তো এনেছি।'

'আমার কাগজের জন্যে?' ভদ্রলোক বসেই ছিলেন, কিন্তু মনে হল যেন আরও বসে গেলেন : 'তা আপনি কি এর আগে আর কখনও লিখেছেন?'

ঈষৎ গর্বের সঙ্গেই আমি জবাব দিলাম, 'না! এই আমার প্রথম চেষ্টা।'

'প্রথম চেষ্টা? বটে?' ভদ্রলোক ঢোক গিললেন, 'আপনার ঘড়িতে কটা এখন?'

ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে অপ্রস্তুত হলাম, মনে পড়ল কদিন থেকেই এটা বন্ধ যাচ্ছে, অথচ ঘড়ির দোকানে দেওয়ার অবকাশ ঘটেনি। সত্য কথা বলতে কী, সম্পাদকের সামনে ঘড়ি না হোক অন্তত ঘড়ির চিহ্নমাত্র না নিয়ে যাওয়াটা 'বে-স্টাইলি' হবে ভেবেই আজ এখন পর্যন্ত ওটা সারাতে দিইনি। এখান থেকে বেরিয়েই বরাবর ঘড়ির দোকানে যাব এই মতলব ছিল।

ঘড়িটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'নাঃ, বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি! কদিন থেকেই মাঝে মাঝে বন্ধ যাচ্ছে।'

'তাই নাকি? দেখি তো একবার!' তিনি হাত বাড়ালেন।

'ঘড়ি মেরামতও জানেন নাকি আপনি!' আমি সম্ভ্রমভরে উচ্চারণ করলাম।

'জানি বলেই তো মনে হয়। কই দেখি, চালানো যায় কি না!'

আমি আগ্রহভরে ঘড়িটা ওঁর হাতে দিলাম—যদি নিখরচায় লেখা আর ঘড়ি এক সঙ্গে চালিয়ে নেওয়া যায়, মন্দ কী!

ভদ্রলোক পকেট থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরি বার করলেন; তার একটা চাড় দিতেই পেছনের ডালার সবটা সটান উঠে এল। আমি চমকে উঠতেই তিনি সান্ত্বনা দিলেন, 'ভয় কী? জুড়ে দেব আবার।'

সেই ভোঁতা ছুরি এবং সময়ে-সময়ে একটা চোঁথা কলমের সাহায্যে তিনি একটার পর একটা ঘড়ির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে ফেলতে লাগলেন। মিনিট এবং সেকেন্ডের কাঁটাও বাদ গেল না। খুঁটিনাটি সব যন্ত্রপাতি টেবিলের ওপর স্তূপাকার হল—তিনি এক-একটাকে চশমার কাছে এনে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সূক্ষ্ম তারের ঘোরানো ঘোরানো কী একটা জালের মতো—বোধহয় হেয়ার-স্প্রিংই হবে—দুহাতে ধরে সেটাকে লম্বা করার চেষ্টা করলেন। দেখতে দেখতে সেটা দু-খান হয়ে গেল, মৃদু হাস্য করে আমার দিকে তাকালেন : তার মানে, ভয় কী, আবার জুড়ে দেব।

ভয় ছিল না, কিন্তু ভরসাও যেন ক্রমশ কমে আসছিল। যেটা জুয়েলের মধ্যে সবচেয়ে স্থূলকায় সেটাকে এবার তিনি দাঁতের মধ্যে চাপলেন, দাঁত বসে কি না দেখবার জন্যেই হয়তো-বা। কিন্তু দন্তস্ফুট করতে না পেরে সেটাকে ছেড়ে ঘড়ির মাথার দিকের দম দেবার গোলাকার চাবিটাকে মুখের মধ্যে পুরলেন তারপর। একটু পরেই কটাস্ করে উঠল; ওটার মেরামত সমাধা হয়েছে বুঝতে পারলাম।

তারপর সমস্ত টুকরো-টাকরা এক করে ঘড়ির অন্তঃপুরে রেখে তলাকার ডালাটা চেপে বন্ধ করতে গেলেন; কিন্তু ডালা তাতে বসবে কেন? সে উঁচু হয়ে রইল। ওপরের ডালাটা আগেই ভেঙেছিল, এবার সেটাকে হাতে নিয়ে আমাকে বললেন, 'আঠার পাত্রটা আগিয়ে দিন তো—দেখি এটাকে!'

অত্যন্ত নিরুৎসাহে গাম-পটটা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আঠার সহায়তায় যথেষ্ট সংগ্রাম করলেন, কিন্তু তাঁর যৎপরোনাস্তি চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ হল। আঠায় কখনো ও জিনিস আঁটানো যায়? তখন সবগুলো মুঠোয় করে আমার দিকে প্রসারিত করলেন,—'এই নিন আপনার ঘড়ি।'

আমি অবাক হয়ে এতক্ষণ দেখছিলাম, বললাম, 'এ কী হল মশাই?'

তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'কেন, মেরামত করে দিয়েছি তো!'

বাবার কাছ থেকে বাগানো দামি ঘড়িটার এই দফা-রফা দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল—'এই বুঝি মেরামত করা? আপনি ঘড়ির যদি কিছু জানেন না তবে হাত দিতে গেলেন কেন?'

'কেন, কী ক্ষতি হয়েছে?' এ কথা বলে তিনি অনায়াসে হাসতে পারলেন—'তা ছাড়া আমারও এই প্রথম চেষ্টা।'

আমি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'ও! আমার প্রথম লেখা বলেই এটা আপনার পছন্দ হয়নি? তা-ই বললেই পারতেন—ঘড়ি ভেঙে এ কথা বলা কেন?' আমার চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো হল, কিন্তু অবাঞ্ছিত অশ্রু কোনোমতে সংবরণ করে, এমনকি অনেকটা আপ্যায়িতের মতো হেসেই অবশেষে বললাম, 'কাল না-হয় আর-একটা নতুন গল্প লিখে আনব, সেটা আপনার পছন্দ হবে। চেষ্টা করলেই আমি লিখতে পারি।'

'বেশ, আসবেন।' এ বিষয়ে সম্পাদকের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল : 'কিন্তু ঐ সঙ্গে আর-একটা নতুন ঘড়িও আনবেন মনে করে। আমাদের দুজনেরই শিক্ষা হবে তাতে। আপনারও লেখার হাত পাকবে, আমিও ঘড়ি সম্বন্ধে পরিপক্বতা লাভ করব।'

পরের দিন 'মরিয়া' হয়েই গেলাম, এবং 'ঘড়িয়া' না-হয়েই। এবার আর গল্প না, তিনটে ছোট ছোট কবিতা—শিম, বেগুন, বরবটির ওপরে।

আমাকে দেখেই সম্পাদক অভ্যর্থনা করলেন, 'এই যে এসেছেন, বেশ। ঘড়ি আছে তো সঙ্গে?'

আমি দমলাম না: 'দেখুন এবারে একেবারে অন্য ধরনের লিখেছি। লেখাগুলো সময়োপযোগী, এমনকি সব সময়ের উপযোগী। এবং যদি অনুমতি করেন তাহলে এ কথাও বলতে সাহস করি যে আপনাদের কাগজের উপযুক্তও বটে। আপনি যদি অনুগ্রহ—'

আরও খানিকটা মুখস্থ করে আনা ছিল কিন্তু ভদ্রলোক আমার আবৃত্তিতে বাধা দিলেন: 'ধৈর্য্য, উৎসাহ, তিতিক্ষা এ সব আপনার আছে দেখছি, পারবেন আপনি। কিন্তু আমাদের মুশকিল কী জানেন, বড় লেখকেরই বড় লেখা কেবল আমরা ছাপতে পারি। প্রবন্ধের শেষে বা তলার দিকে দেওয়া চলে এমন ছোটখাট খুচরো-খাচরা যদি আপনার কিছু থাকে তাহলে বরং—। এই ধরুন, চার লাইনের কবিতা কিংবা কোনো কৌতুক-কণা—'

আমি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলাম—'হ্যাঁ, কবিতা। কবিতাই এনেছি এবার। পড়ে দেখুন আপনি, রবীন্দ্রনাথের পরে এমন কবিতা কেউ লিখেছে কি না সন্দেহ।'

তিনি কবিতা তিন পিস হাতে নিলেন এবং পড়তে শুরু করে দিলেন :

শিম

শিমের মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
ধামার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সপ্রশংস অভিব্যক্তি দেখা গেল—'বাঃ, বেড়ে হয়েছে! আপনি বুঝি শিমের ভক্ত? শিম খেয়ে থাকেন খুব? অত্যন্ত ভালো জিনিস! যথেষ্ট ভিটামিন।'

'শিম আমি খাইনে। বরং অখাদ্যই মনে করি। তবে, এ কবিতাটা লিখতে হিমশিম খেয়েছি।'

'হ্যাঁ, এগুলো চলবে। খাসা কবিতা লেখেন আপনি : বরবটির সঙ্গে চটপটির মিলটা মন্দ না। তুলনাটাও ভালো—তা, এক কাজ করলে তো হয়!—' অকস্মাৎ তিনি যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেন, 'দেখুন, ভিটামিনের কাগজ বটে, কিন্তু ভিটামিন আমরা খুব কমই খাই। কলা বাদ দিয়ে কলার খোসা কিংবা শাঁস বাদ দিয়ে আলুর খোলার সারাংশ প্রায়ই খাওয়া হয়ে ওঠে না। এইজন্যে মাসকয়েক থেকে বেরিবেরিতে ভুগতে হচ্ছে; তা আপনি যদি—' তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, পারব। খুব পারব। ঝুড়ি-ঝুড়ি কলার খোসা আপনাকে জোগাড় করে দেব। কিন্তু শুধু খোসা তো কিনতে পাওয়া যায় না, কলার দামটা আপনিই দেবেন!' তাঁর সমর্থনের অপেক্ষায় একটু থামলাম, 'কলাগুলো আমিই না-হয় খাব কষ্টেসৃষ্টে—যদিও অনুপকারী, তবু বেরিবেরি না হওয়া পর্যন্ত খেতে তো কোনো বাধা নেই?'

'না, সে কথা নয়। আমি বলছি কি, আমি তিন মাসের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় হাওয়া বদলাতে যেতাম, আপনি যদি সেই সময়ে আমার কাগজটা চালাতেন।'

'আমি!' এবার আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন।

'তা, লিখতে না জানলেও কাগজ চালানো যায়। লেখক হওয়ার চেয়ে সম্পাদক হওয়া অনেক সোজা। আপনার সঙ্গে আমার এই চুক্তি থাকবে: আপনাকে নামজাদা লেখকের তালিকা দিয়ে যাব, তাঁদের লেখা সংগ্রহ করে আপনি চোখ বুজে চালিয়ে দেবেন—কেবল কপি মিলিয়ে প্রুফ দেখে দিলেই হল। সেইসব লেখার শেষ পাতায় তলায় তলায় যা এক-আধটু জায়গা পড়ে থাকবে সেখানে আপনার এই ধরনের ছোট ছোট কবিতা আপনি ছাপতে পারবেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। এইরকম কৃষি-কবিতা—ওলকপি, গোলআলু, শকরকন্দ—যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।'

বলা বাহুল্য, আমাকে রাজি করাতে ভদ্রলোককে মোটেই বেগ পেতে হল না। সহজেই আমি সম্মত হলাম। এ যেন আমার হাতে স্বর্গ পাওয়া—গাছে না-উঠতেই এক কাঁদি! সম্পাদক শিকার করতে এসে সম্পাদকতা স্বীকার—তোমাদের মধ্যে খুব কম অজাতশ্মশ্রু লেখকেরই এ রকম সৌভাগ্য হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

সম্পাদনা-কাজের গোড়াতেই একজোড়া চশমা কিনে ফেললাম। ফাউন্টেন পেন তো ছিলই। অতঃপর সমস্ত জিনিসটাই পরিপাটিরকম নিখুঁত হল। কলম

বাগিয়ে 'কৃষিতত্ত্বে'র সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করলাম। যদিও সম্পাদকীয় লেখার জন্যে ঘুণাক্ষরেও কোনো অনুরোধ ছিল না সম্পাদকের, কিন্তু ওটা বাদ দিলে সম্পাদকতা করার কোনো মানেই হয় না, আমার মতে। অতএব লিখলাম :

'আমাদের দেশে ভদ্রলোকদের মধ্যে কৃষি-সম্বন্ধে দারুণ অজ্ঞতা দেখা যায়। এমনকি, অনেকের এরকম ধারণা আছে যে যে-সব তক্তা আমরা দেখি, দরজা, জানলা, কড়ি, বরগা, পেনসিল, তক্তপোশে যে-সব কাঠ সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় সে সমস্ত ধানগাছের। এটা অতীব শোচনীয়। তাঁরা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ওগুলো ধান তো নয়ই, বরঞ্চ পাটগাছের বলা যেতে পারে। অবশ্য পাটগাছ ছাড়াও কাঠ জন্মায়; আম, জাম, কাঁঠাল, কদবেল ইত্যাদি বৃক্ষেরাও তক্তাদান করে থাকে। কিন্তু নৌকোর পাটাতনে যে কাঠ ব্যবহৃত হয় তা কেবলমাত্র পাটের—...'

ইত্যাদি—এইভাবে একটানা প্রায় আড়াই পাতা কৃষিতত্ত্ব। কাগজ বেরুতে-না-বেরুতে আমার সম্পাদকতার ফল প্রত্যক্ষ করা গেল। মোটে পাঁচশো করে আমাদের ছাপা হত, কিন্তু পাঁচশো কাগজ বাজারে পড়তেই পেল না। সকাল থেকে প্রেস চালিয়ে, সাতগুণ ছেপেও অনেক হকারকে শেষে ক্ষুণ্নমনে ও শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে হল।

সন্ধ্যার পরে যখন অপিস থেকে বেরুলাম, দেখলাম একদল লোক আর বালক সামনের রাস্তায় জড়ো হয়েছে। আমাকে দেখেই তারা তৎক্ষণাৎ ফাঁকা হয়ে আমার পথ করে দিল। দু-একজনকে যেন বলতেও শুনলাম, 'ইনি, ইনিই!' স্বভাবতই খুশি হয়ে উঠলাম। না হব কেন?

পরদিনও অপিসের সামনে সেইরকম লোকের ভিড়, দল পাকিয়ে দু-চারজন করে এখানে ওখানে ছড়িয়ে, রাস্তার এধারে ওধারে, দূরে সুদূরে (কিন্তু অনতি নিকটে), প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়েই ব্যক্তিবর্গ। সবাই বেশ আগ্রহের সঙ্গে আমাকে লক্ষ করছে। তাদের কৌতূহলের পাত্র আমি বুঝতে পারলাম বেশ; এবং পেরে আত্মপ্রসাদ হতে লাগল।

আমি কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিচলিত হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, আমি দ্বিধাবোধ করার আগেই মণ্ডলীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। একজন বলে উঠল, 'ওর চোখের দিকে তাকাও—কী রকম চোখ দেখেছ!' আমিই যে ওদের লক্ষ্য এটা যেন লক্ষ করছি না এইরকম ভাব দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, মনে মনে বেশ পুলক সঞ্চার হচ্ছিল আমার। ভাবলাম, এ সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া বর্ণনা দিয়ে আমার আজই বড়দাকে একখানা চিঠি ছেড়ে দেব।

দরজা ঠেলে আপিস-ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, দুজন গ্রাম্যগোছের লোক আমার চেয়ার এবং টেবিল ভাগাভাগি করে বসে আছে—বসার কায়দা দেখলে মনে হয়

লাঙল ঠেলাই ওদের পেশা। আমাকে দেখেই তারা তটস্থ হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে যেন তাদের লজ্জায় ম্রিয়মাণ বলে আমার বোধ হল, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাদের আর দেখতে পেলাম না—ওধারের জানলা টপকে ততক্ষণে তারা সটকেছে। অপিস-ঘরে যাতায়াতের অমন দরজা থাকতেও তা না ব্যবহার করে অপ্রশস্ত জানলাই-বা তারা কেন পছন্দ করল, এই অদ্ভুত কাণ্ডের মাথামুণ্ডু নির্ণয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সযত্নলালিত ছড়ি হস্তে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দাড়ির চাকচিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। চেয়ারে ছড়ির ঠেসান দিয়ে দাড়িকে হস্তগত করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি নতুন সম্পাদক?'

আমি জানালাম, তাঁর অনুমান যথার্থ।

'আপনি কি এর আগে কোনো কৃষি-কাগজের সম্পাদনা করেছেন?'

'আজ্ঞে না,' আমি বললাম, 'এই আমার প্রথম চেষ্টা'।

'তা-ই সম্ভব।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'হাতে-কলমে কৃষি-কাজের কোনো অভিজ্ঞতা আছে আপনার?'

'একদম না।' স্বীকার করলাম আমি।

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে।' ভদ্রলোক পকেট থেকে ভাঁজকরা এই সপ্তাহের একখানা 'কৃষিতত্ত্ব' বার করলেন : 'এই সম্পাদকীয় আপনার লেখা, নয় কি?'

আমি ঘাড় নাড়ালাম,—'এটাও আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'আমার আন্দাজ ঠিক।' বলে তিনি পড়তে শুরু করলেন :

'মুলো জিনিসটা পাড়বার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কখনও টেনে ছেঁড়া উচিত নয়। ওতে মুলোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বরং একটা ছেলেকে গাছের ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে ডালপালা ধরে নাড়তে দিলে ভালো হয়। খুব কষে নাড়া দরকার। ঝাঁকি পেলেই টপাটপ মুলোবৃষ্টি হবে, তখন কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁকা ভরো।...

'এর মানে কী আমি জানতে চাই!' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে যেন উষ্মার আভাস ছিল।

'কেন? এর মানে তো স্পষ্ট।' বৃদ্ধ ব্যক্তির বোধশক্তিহীনতা দেখে আমি হতবাক হলাম, 'আপনি কি জানেন, কত হাজার হাজার, কত লাখ লাখ মুলো অর্ধপক্ব অবস্থায় টেনে ছিঁড়ে নষ্ট করা হয় আমাদের দেশে? মুলো নষ্ট হয়ে গেলে কার যায় আসে? কেবল যে মুলোরই তাতে অপকার করা হয় তা নয়, আমাদের—আমাদেরও ক্ষতি তাতে। দেশেরই তাতে সর্বনাশ, তার হিসেব রাখেন? তার চেয়ে যদি মুলোকে গাছেই পাকতে দেওয়া হত এবং তারপরে একটা ছেলেকে গাছের ওপরে—'

'নিকুচি করেছে গাছের! মুলো গাছেই জন্মায় না!'

'কী! গাছে জন্মায় না! অসম্ভব—এ কখনো হতে পারে? মানুষ ছাড়া সবকিছুই গাছে জন্মায়। এমনকি বাঁদর পর্যন্ত।'

ভদ্রলোকের মুখবিকৃতি দেখে বুঝলাম, বিরক্তির তিনি চরম সীমায়। রেগে 'কৃষিতত্ত্ব'খানা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফুঁ দিয়ে ঘরময় উড়িয়ে দিলেন—তারপর নিজের ছড়িতে হস্তক্ষেপ করলেন। আমি শঙ্কিত হলাম—লোকটা মারবে নাকি! কিন্তু না, আমাকে ছাড়া টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আলমারি, ঘরের সবকিছু ছড়িপেটা করে, অনেক কিছু ভেঙেচুরে, অনেকটা শান্ত হয়ে, অবশেষে সশব্দে দরজায় ধাক্কা মেরে তিনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। লোকটা কোনো ইস্কুলের মাস্টার নয় তো!

আমি অবাক হলাম। ভদ্রলোক ভারি চটে গেলেন তা তো স্পষ্টই, কিন্তু কেন যে কী সম্বন্ধে তাঁর এত অসন্তোষ তা কিছু বুঝতে পারলাম না।

এই দুর্ঘটনার একটু পড়েই আগামী সপ্তাহের সম্পাদকীয় লেখবার জন্যে সুবিধে-মতো জাঁকিয়ে বসছি, এমন সময় দরজা ফাঁক করে কে যেন উঁকি মারল। যারা জানালা-পথে পালিয়েছিল সেই 'চষ্য'-রাজাদের একজন নাকি? কিন্তু না, নিরীক্ষণ করে দেখলাম, বিশ্রী চেহারার জনৈক বদখৎ লোক। লোকটা ঘরে ঢুকেই যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেল; ঠোঁটে আঙুল চেপে, ঘাড় বেঁকিয়ে, কুঁজো হয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল। কোথাও শব্দমাত্র ছিল না। তথাপি সে শুনতে লাগল। তবু কোনো শব্দ নেই। তারপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে টিপে আমার কাছাকাছি এগিয়ে এসে সুতীব্র ঔৎসুক্যে আমাকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ একেবারে নিস্পলক, তার পরেই কোটের বোতাম খুলে হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে একখণ্ড 'কৃষিতত্ত্ব' বার করল।

'এই যে—তুমি! তুমিই লিখেছ তো? পড়ো—পড়ো এইখানটা, তাড়াতাড়ি! ভারি কষ্ট হচ্ছে আমার!'

আমি পড়তে শুরু করলাম:

'মুলোর বেলা যে-রকম আলুর বেলা সে-রকম করা চলবে না। গাছ-ঝাঁকি দিয়ে পাড়লে আলুরা চোট খায়, এই কারণেই আলু পচে এবং তাতে পোকা ধরে। আলুকে গাছে বাড়তে দিতে হবে—যতদূর খুশি সে বাড়ুক। এরকম সুযোগ দিলে এক-একটা আলুকে তরমুজের মতো বড় হতে দেখা গেছে। অবশ্য বিলাতেই; এ দেশে আমরা আলু খেতেই শিখেছি, আলুর যত্ন নিতে শিখিনি। আলু যথেষ্ট বেড়ে উঠলে এক-একটা করে আলাদা আলাদা ফজলি আমের মতন তাকে ঠুসি-পাড়া করতে হবে।'

'তবে পেঁয়াজ আমরা আঁকশি দিয়ে পাড়তে পারি, তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। অনেকের ধারণা পেঁয়াজ গাছের ফল, বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বরং ওকে ফুল বলা যেতে পারে—ওর কোনো গন্ধ নেই, যা আছে কেবল

দুর্গন্ধ। ওর খোসা ছাড়ানো মনেই ওর কোরক ছাড়ানো। এনতার কোরক ওর। পেঁয়াজেরই অপর নাম শতদল।'

'অতি প্রাচীনকালেও এদেশে ফুলকপি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাকে আহার্যের মধ্যে তখন গণ্য করা হত না। শাস্ত্রে বলেছে অলাবুভক্ষণ নিষেধ, সেটা এই ফুলকপি সম্বন্ধেই। আর্যেরা কপি খেতেন না, ওটা অনার্য হাতিদের খাদ্য ছিল। 'গজভুক্ত কপিত্থ' এই প্রবাদে তার প্রমাণ রয়েছে।'

'বাতাবিলেবুর গাছে কমলালেবু ফলানোর সহজ উপায় হচ্ছে এই—'

'ব্যস ব্যস,—এতেই হবে!' আমার উৎসাহী পাঠক উত্তেজিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়াবার জন্যে হাত বাড়াল। 'আমি জানি আমার মাথা ঠিকই আছে, কেননা তুমি যা পড়লে আমিও ঠিক তা-ই পড়েছি, ওই কথাগুলোই। অন্তত আজ সকালে, তোমার কাগজ পড়ার আগে পর্যন্ত এই ধারণাই আমার ছিল। যদিও আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে সব সময়ে নজরে নজরে রাখে, তবু এই ধারণা আমার প্রবল ছিল যে মাথা আমার ঠিকই আছে—'

তার সংশয় দূর করার জন্যে আমি সায় দিলাম, 'নিশ্চয়! নিশ্চয়! বরং অনেকের চেয়ে বেশি ঠিক এ কথাই আমি বলব। এইমাত্র একজন বুড়ো লোক—কিন্তু যাক সে কথা।'

লোকটাও সায় দিল,—'হ্যাঁ, যাক। তবে আজ সকালে তোমার কাগজ পড়ে সে-ধারণা আমার টলেছে। এখন আমি বিশ্বাস করি যে সত্যি-সত্যিই আমার মাথা খারাপ। এই বিশ্বাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক দারুণ চিৎকার ছেড়েছি—নিশ্চয়ই তুমি এখানে বসে তা শুনতে পেয়েছ!'

আমি ঘাড় নাড়লাম, কিন্তু আমার অস্বীকারোক্তি সে আমল দিল না—'নিশ্চয় পেয়েছ। দু-মাইল দূর থেকে তা শোনা যাবে। সেই চিৎকার ছেড়েই এই লাঠি নিয়ে আমি বেরিয়েছি, কাউকে খুন না-করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি হচ্ছে না! তুমি বুঝতেই পারছ আমার মাথার যা অবস্থা তাতে একদিন-না একদিন কাউকে না-কাউকে খুন আমায় করতেই হবে—তবে আজই শুরু করা যাক-না কেন?'

কী জবাব দেব ভেবে পেলাম না, একটা অজানা আশঙ্কায় বুক দুরদুর করতে লাগল।

'বেরুবার আগে আর-একবার তোমার প্যারাগুলো পড়লাম, সত্যিই আমি পাগল কি না নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। তার পরক্ষণেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় যাকে পেয়েছি তাকেই ধরে ঠেঙিয়েছি। অনেকে খোঁড়া হয়েছে, অনেকের মাথা ভেঙেছে; সবশুদ্ধ কতজন হতাহত বলতে পারব না। তবে একজনকে জানি। সে গাছের উপর উঠে বসে আছে! গোলদিঘির

ধারে। ইচ্ছে করলেই আমি তাকে পেড়ে আনতে পারব। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল তোমার সঙ্গে একবার মোলাকাত করে যাই—'

হৃৎকম্পের কারণ এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম—কিন্তু বোঝার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প একেবারেই বন্ধ হবার জোগাড় হল যেন!

'কিন্তু তোমায় আমি সত্যি বলছি, যে-লোকটা গাছে চেপে আছে তার কপাল ভালো। এতক্ষণ তবু বেঁচে রয়েছে বেচারা। ওকে খুন করে আসাই উচিত ছিল আমার। যাক ফেরার পথে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। এখন আসি তাহলে—নমস্কার।'

লোকটা চলে গেলে ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ল। কিন্তু এতগুলো লোক যে আমার লেখার জন্যেই খুন-জখম হয়েছে, হাত-পা হারিয়েছে এবং একজন গোলদিঘির ধারে এখনও গাছে চেপে বসে আছে—এইসব ভেবে মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু অচিরেই এইসব দুশ্চিন্তা দূরীভূত হল, কেননা, 'কৃষিতত্ত্বে'র আটপৌরে সম্পাদক অপ্রত্যাশিতরূপে প্রবেশ করলেন।

সম্পাদকের মুখ গম্ভীর, বিষণ্ন। চেঞ্জে গিয়েই অবিলম্বে ফিরে আসার জন্যই বোধহয়। আমরা দুজনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পরে একটিমাত্র কথা তিনি বললেন, 'তুমি, আমার কাগজের সর্বনাশ করেছ!'

আমি বললাম, 'কেন, কাটতি তো অনেক বেড়েছে!'

'হ্যাঁ কাগজ বহুত কেটেছে, আমি জানি। কিন্তু আমার মাথাও কাটা গেছে সেইসঙ্গে।' তারপরে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কীর্তিকলাপ তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, চারদিকে ভাঙাচোরা দেখে তিনি নিজেও যেন ভেঙে পড়লেন—'সত্যি বড় দুঃখের বিষয়, বড়ই দুঃখের বিষয়। 'কৃষিতত্ত্বে'র সুনামের যে হানি হল, যে বদনাম হল, তা বোধহয় আর ঘুচবে না। অবিশ্যি কাগজের এত বেশি বিক্রি এর আগে কোনোদিন হয়নি বা এমন নামডাকও চারধারে ছড়িয়ে পড়েনি—কিন্তু পাগলামির জন্যে বিখ্যাত হয়ে কী লাভ? একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দ্যাখ দিকি চারধারে কী রকম ভিড়—কী শোরগোল! তারা সব দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখার জন্যে। তাদের ধারণা তুমি বদ্ধ পাগল। তাদের দোষ কী? যে তোমার সম্পাদকীয় পড়বে তারই ঐ ধারণা বদ্ধমূল হবে। তুমি যে চাষবাসের বিন্দুবিসর্গও জান তা তো মনে হয় না। কপি আর কপিত্থ যে এক জিনিস এ কথা কে তোমাকে বলল? গোল-আলুর সম্বন্ধে তুমি যে গবেষণা করেছ, মুলো চাষের যে আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছ সে সম্বন্ধে তোমার কোনোই অভিজ্ঞতা নেই। তুমি লিখেছ শামুক অতি উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু তাদের ধরা অতিশয় শক্ত। মোটেই তা নয়, শামুক মোটেই সারবান নয় এবং তাদের দ্রুতগতির কথা এই প্রথম জানা গেল। কচ্ছপেরা সঙ্গীতপ্রিয়, রাগ-রাগিণীর সম্মুখে তারা মৌনী হয়ে থাকে, সেটা তাদের মৌনসম্মতির লক্ষণ, তোমার এ

মন্তব্য—একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কচ্ছপদের সুরবোধের কোনোই পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনিই ওরা চুপচাপ থাকে, মৌনী হয়ে থাকাই ওদের স্বভাব—সঙ্গীতের কোনো ধারই ধারে না তারা। কচ্ছপদের দ্বারা জমি চষানো অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। আপত্তি না করলেও জমি তারা চষবে না—তারা তো বলদ নয়। তুমি যে লিখেছ, ঘোড়ামুগ ঘোড়ার খাদ্য আর কলার বিচি থেকে কলাই হয়, তার ধাক্কা সামলাতে আমার কাগজ উঠে না গেলে বাঁচি! গাছের ডাল আর ছোলার ডালের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, দেড় পাতা খরচ করে তা বোঝাবার তোমার কোনোই দরকার ছিল না। কেবল তুমি ছাড়া আর সবাই এ কথা জানে। যাক, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি বিদায় নাও। তোমাকে আর সম্পাদকতা করতে হবে না। আমার আর বায়ু-পরিবর্তনে কাজ নেই—ঘাটশিলায় গিয়ে আমাকে দৌড়ে আসতে হয়েছে—তোমার পাঠানো কাগজের কপি পেয়ে অবধি আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পরের সপ্তাহে আবার তুমি কী গবেষণা করে বসবে সেই ভয়েই আমার বুক কেঁপেছে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! যখনই তোমার ঘোষণার কথা ভেবেছি—জাম, জামরুল আর গোলাপ-জাম কী করে একই গাছে ফলানো যায়, পরের সংখ্যাতেই তুমি তার উপায় বাতলে দেবে, তখন থেকেই নাওয়া-খাওয়া আমার মাথায় উঠেছে—বেরিবেরিতে প্রাণ যায় সেও ভালো—তখনই আমি কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে চেপেছি।'

এতক্ষণ বক্তৃতার পর ভদ্রলোক এক দারুণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। ওঁরই কাগজের কাটতি আর খ্যাতি বাড়িয়ে দিলাম, আয়ও বেড়ে গেল কত, অথচ উনিই আমাকে গালমন্দ করেছেন! ভদ্রলোকের নেমকহারামি দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। অতএব, শেষবিদায় নেওয়ার আগে আমিই-বা ক্ষান্ত হই কেন? আমিও বলে যাব। এত কিসের খাতির?

'বেশ, আমার কথাটাও শুনুন তবে। আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই, আপনি একটি আস্ত বাঁধাকপি। এ রকম অনুদার মন্তব্য যা এতক্ষণ আমাকে শুনতে হয়েছে তা শুনব বলে কোনোদিন আমি কল্পনাও করিনি। কাগজের সম্পাদক হতে হলে কোনো কিছু জানতে হয়, তা-ও আমি এই প্রথম জানলাম। এতদিন তো দেখে আসছি যারা বই লিখতে পারে না তারাই ফুটবল খেলা দেখতে যায়। আপনি নিতান্তই শালগম তাই এ কথা বুঝতে আপনার বেগ পেতে হচ্ছে। যদি নেহাত ভূমিকুষ্মাণ্ড না হতেন তাহলে অবশ্য বুঝতেন যে 'কৃষিতত্ত্বে'র কী উন্নতি আর আপনার কতখানি উপকার আমি করেছি। আমার গায়ে জোর থাকলে আপনার মতো গাজরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে যেতাম। কী আর বলব আপনাকে—পালংশাক, পানিফল, তালশাঁস যা খুশি বলা যায়। আপনাকে পাতিলেবু বললে পাতিলেবুর অপমান করা হয়—'

দম নেবার জন্যে আমাকে থামতে হল। গায়ের ঝাল মিটিয়ে গালাগালের শোধ তুললাম, কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে নির্বাক। আবার আরম্ভ করলাম আমি—

'হ্যাঁ এ কথা সত্যি, সম্পাদক হবার জন্যে আমি জন্মাইনি! যারা সৃষ্টি করে আমি তাদেরই একজন, আমি হচ্ছি লেখক। ভুঁইফোড় কাগজের সম্পাদক হয় কারা? আপনার মতো লোক—নিতান্তই যারা টম্যাটো। সাধারণত যারা কবিতা লিখতে পারে না, আট-আনা সংস্করণের নভেলও যাদের আসে না, পিলে-চমকানো থিয়েটারি নাটক লিখতেও অক্ষম, প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রেও অপারগ, তারাই অবশেষে হাত-চুলকোনো থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপনার মতো কাগজ বের করে বসে। আপনি আমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করেছেন তাতে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে আমার রুচি নেই! এই দণ্ডেই সম্পাদক-গিরিতে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। 'চাষাড়ে' কাগজের সম্পাদকের কাছে ভদ্রতা আশা করাই বাতুলতা! ঘড়ির দুর্দশা দেখেই আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। যাব তো আমি নিশ্চয়, কিন্তু জানবেন, আমার কর্তব্য আমি করে গেছি, যা চুক্তি ছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি আমি। বলেছিলাম আপনার কাগজ সর্বশ্রেণীর পাঠ্য করে তুলব—তা আমি করেছিও। বলেছিলাম আপনার কাগজের কুড়ি হাজার গ্রাহক করে দেব—যদি আর দু সপ্তাহ সময় পেতাম তা-ও আমি করতে পারতাম। এখন—এখনই আপনার পাঠক কারা? কোনো চাষের কাগজের বরাতে যা কোনোদিন জোটেনি সেইসব লোক আপনার কাগজের পাঠক—যত উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, মোক্তার, হাইকোর্টের জজ, কলেজের প্রফেসর, যতসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। একজনও চাষা নেই ওর ভেতর—যত চাষা গ্রাহক ছিল তারা সব চিঠি লিখে কাগজ ছেড়ে দিয়েছে—ঐ দেখুন টেবিলের ওপর চিঠির গাদা। কিন্তু আপনি এমনই চালকুমড়ো যে পাঁচশো মুখ্যু চাষার জন্যে বিশ হাজার উচ্চশিক্ষিত গ্রাহক হারালেন! এতে আপনারই ক্ষতি হল, আমার কী আর! আমি চললাম।'

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সমস্যার চূড়ান্ত

সকালবেলা বিছানা ছেড়েই, হাত-মুখও ধুইনি, অসমাপ্ত উপন্যাসটার উপসংহারে উঠে-পড়ে লেগেছি। প্লট কথাটার অর্থের মধ্যেই একটা চক্রান্ত আছে, উবে যাওয়ার, উধাও হবার, অপর কারও খপ্পরে পড়ে খোয়া যাবার ইঙ্গিত উহ্য রয়েছে যেন, যদি সময়মতো আগিয়ে গিয়ে বাগিয়ে না রাখো তা হলে চট করে উনি সটকে পড়েছেন কোনদিকে।

অতএব বিছানা ছেড়ে প্লটের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছি। এমন সময়ে, হাফপ্যান্টপরা একজন হুড়মুড় করে টেবিলের কাছে এসে হাজির।

'মিস আইভি আপনাকে ডেকে দিতে বললেন। শুনছেন মশাই?'

শুনতে-না-শুনতেই ফ্রকপরা আরেকজন ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে, 'আইভিদি একবারটি ডাকছেন আপনাকে।'

মিস আইভি আমার ক্ষুদ্রকায় পাড়াপড়শিদের অন্যতম নন, দস্তুরমতন একজন শিক্ষয়িত্রী, এই বৎসরে কলেজ থেকে বেরিয়ে এক মেয়ে-ইস্কুলে ঢুকেছেন। আর বাসা নিয়েছেন আমাদের পাড়ায়, আমারই পাশের বাড়ি মেয়েদের বোর্ডিঙে।

কাজেই ডাক পেয়ে উঠতে হল।

প্লট উবে যায় যাক, ওঁকে উপেক্ষা করা যায় না তো!

তাছাড়া মাস্টারদের প্রতি আমার চিরকালের ভীতি, তা সে মেয়ে-মাস্টারই কী আর ছেলে-মাস্টারই কী। নাম শুনলেই কাঠ হয়ে যাই, কেমন ঘাবড়ে যাই ভয়ানক। ওইজন্যেই বোধহয়, আর এ জন্মে ইস্কুলে-কলেজের চৌকাঠ ডিঙোনো গেল না আমার। কী করে যাবে? ইংরেজি আর অঙ্ক, ইতিহাস আর ভূগোল সবটাতেই আমি কাঁচা, বিশেষ করে অঙ্কটায় তো বেধড়ক। আর এই বাংলাতেই কি খুব সুবিধা করতে পেরেছি?

আমার তো মনে হয় না।

অতএব, ভয়ে ভয়েই উঠে পড়ি। কী জানি, এক্ষুনি যদি আইভি দিদি এসে পড়ে আমার বানান ভুল কাটাকাটি করতে শুরু করেন, আমাকে মার্জনা না করে আমার লেখার পরিমার্জনায় লেগে যান, ভাষাকে আরও সাধু আর সুস্বাদু করতে সচেষ্ট হন, অসমাপ্ত গল্পের আগাপাশতলা শুধরে দেন সব? তা হলেই তো গিয়েছি! হয়ে গেছে আমার!

আমার ঘরে অবিশ্যি বেঞ্চি নেই, কিন্তু তাতেই-বা কী ভরসা? টেবিল তো রয়েছে। আর ঐ ছোট্ট টেবিলের ওপরে এই ভারী বয়সে আমি... আবার যদি দণ্ডায়মান...? না, না, কিছুতেই না। ভালো করে ভাবতে-না-ভাবতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়ে গেছি।

'এই যে মিস সেন। ডেকেছেন আমাকে?' রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে বলি।

শ্রীমতী আইভি বলেন: 'হ্যাঁ, একটু ডেকেছিলাম। আপনি হন্তদন্ত হয়ে এসেছেন দেখছি! হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি কিনা আজ! সামার ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল! বোর্ডিঙের মেয়েরা সবাই চলে গেছে, কালই বাড়ি চলে গেছে সব। আমিও চেঞ্জে যাচ্ছি ছুটিতে।'

'ও তা-ই নাকি? তা বেশ তো!'

এর বেশি কী বলব? ছুটি হয়েছে তো আমার কী? আমাকে ছুটোছুটি করানো কেন? এই সক্কালে এমন উদ্বাস্ত করে এইভাবে আমার গল্পের কবল থেকে সবলে ছিন্ন করে এনে উদ্বাস্তু করা? সামার ভ্যাকেশনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? বিন্দুবিসর্গও আমি ঠাউরে উঠতে পারি না।

'চেঞ্জে যাচ্ছি কিনা'—আমতা-আমতা করে শুরু করেন উনি।

'দেখুন', বাধা দিয়ে আমি বলি: 'কলকাতা ছেড়ে কোথাও এক পা-ও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সব কথা খুলেই বলছি আপনাকে। চেঞ্জে যেতে একদম ভালো লাগে না আমার। নড়াচড়ার কথা ভাবতে গেলেই জ্বর এসে যায়। আমাকে যদি একতলা থেকে দোতলায় চেঞ্জে পাঠান তা হলেই আমি মারা পড়ব। তাছাড়া আমি হাত-মুখ ধুইনি। চা খাইনি পর্যন্ত।'

'না, না, আপনাকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। সেজন্যে ডাকিনি। ডেকেছিলাম, একটা অনুরোধ ছিল...'

'বলুন, কী করতে হবে।'

'একটা অদ্ভুত অনুরোধ। কিছু মনে করবেন না যেন।'

'কিচ্ছু মনে করব না। বলেই দেখুন। আমাকে বলতে বাধা কী?'

'সিটি বুকিং থেকে কালই টিকিট কেনা হয়েছে। মালপত্র সব চাকরের সঙ্গে ইস্টিশনে পাঠিয়ে দিয়েছি সকালে। দরজায় তালা লাগানো হয়ে গেছে। এখন ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লেই হয়। কেবল—'

কেবল বলে কী বলবার জন্য তিনি থামেন।

আমাকেই ট্যাক্সি ডাকতে হবে নাকি? সেইজন্যেই কি ডাকা হয়েছে এত তাড়া দিয়ে? এবং দরজায় তালা লাগিয়ে? ব্যাপারটা ক্রমশই একটু যেন ট্যাকসিং হয়ে পড়ছে মনে হয়। 'রিকশা করে গেলে হয় না? একটা রিকশা ডেকে দিই বরং?'

'উঁহুঁ, রিকশা নয়! আপনাকে দয়া করে আমার বাড়ির মধ্যে একবারটি সেঁধুতে হবে। সেই কথাই বলছিলাম।'

'বাড়ির মধ্যে? কিন্তু তালা লাগিয়ে দিয়েছেন তো!' আমি একটু আশ্চর্যই হই।

'হ্যা, সেইজন্যেই ডেকেছি। তালা ভাঙা যাবে না তো! আর ওই বিলিতি চাবস ভাঙা সোজাও নয়। তালা না ভেঙেই, কষ্ট করেই, একটু সেঁধুতে হবে আপনাকে।'

'ও! চাবি হারিয়েছেন বুঝি, না, ভেতরে ফেলে এসেছেন ভুলে?' ব্যাপারটা তলিয়ে দেখি! 'কিন্তু তা-ই বা কী করে সম্ভব? বাইরে এসেই তো তালা লাগাতে হয়েছে? তবে? এর মধ্যেই এইটুকুর ভেতর আবার চাবি হারালেন কোথায়?'

সে কথার জবাব না দিয়ে তিনি বলেন—'চাবির কথা রাখুন! বাড়ির দেয়ালের খাঁজ বেয়ে বেয়ে উঠে—উঠতে পারবেন না আপনি? তেতলার কোণের কারনিস-ঘেঁষা ঐ জানালাটা খুলে ফেললেই ভেতরে ঢোকা যাবে। ও-জানালাটায় শিক লাগানো নেই। খুব শক্ত হবে কি আপনার পক্ষে?'

'না, এমন আর শক্ত কী?' একটু ম্লান হেসে বলি : 'তবে একটা কথা। খুব জরুরি জিনিস ভেতরে ফেলে এসেছেন নাকি? এমন কিছু যা না-হলেই চলে না? তেমন যদি না হয় তবে—যদি এমনিতেই চলে যায় তা হলে—চেঞ্জের পর ফিরে এলে তখনই না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত। উঠেপড়ে লাগা যেত তখনই। কী বলেন?'

'চেঞ্জের পর ফিরে? তখন? তখন কেন?' শ্রীমতী আইভির সন্দিগ্ধ স্বরই শোনা যায় যেন।

'এর মধ্যে তা হলে একটা লাইফ ইনসিওর করে নিতে পারতাম।'

'আপনার যেমন কথা! তেতলা থেকে পড়লে কেউ মারা পড়ে না। বড়জোর খোঁড়া হয়ে যেতে পারে।' মিষ্টি করে একটুখানি হেসে আইভি বলেন : 'তা, খোঁড়া হতে এত ভয় কিসের? বিয়ে-থা তো করেননি, করতে যাচ্ছেনও না, কেউ মেয়েও দিচ্ছে না আপনাকে! তবে?'

'দেখুন, পায়ে খোঁড়া হতে আমি তেমন ভয় পাইনে। কোনোদিন দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন হবার দুরাকাঙ্ক্ষা নেই আমার। পা থাকলেই-বা কী আর গেলেই-বা কী? আসলে পায়ের বদলে কাঠের পা বরং ভালোই। কাঠের পায়ে বাত ধরবার ভয় নেইকো। বেশি বয়সে কোনো বাতচিত হবার কথাই নেই বলতে গেলে। বাত চিত হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। কিন্তু—লিখেটিখেই পেট চালাতে হয় কিনা! যদি বেকায়দায় পড়ে গিয়ে হাতে খোঁড়া হয়ে যাই?'

'সাবধানে উঠবেন, পড়বেন কেন? চোরেরা ওঠে কেমন করে?' শ্রীমতী আইভির অনুপ্রেরণা পাই।

পাবামাত্রই, অন্তরের মধ্যে আপনাকে প্রেরণ করি। মনের মধ্যে হাতড়াই। চুরি করিনি যে এমন নয়, না, নিজের প্রতি এতবড় দোষারোপ করতে পারব না, কিন্তু দেয়াল বেয়ে কখনো চুরি করেছি কি না, কিছুতেই স্মরণ করতে পারি না।

'বেশ, দেয়াল বেয়ে উঠতে আপনার আপত্তি থাকে'—শ্রীমতী আরও সহজ পথ বাতলান : 'ড্রেনের পাইপ ধরে উঠতে পারেন। সেইটাই সোজা বরং। পাইপ ধরে ধরে কারনিসটার কাছে গিয়ে ভেতরে হাত গলিয়ে জানালাটা খুলে ফেলুন, তারপর ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি ধরে নেমে এসে খিড়কির দরজাটা খুলে দিন আমায়।'

খুব সহজ কাজ। আইভির কথা জলের মতো তরল।

'ভারি ভীতু দেখছি আপনি!' আইভির অনুযোগ শুনতে হয়।

তা বটে! সেইরকম আমারও সন্দেহ। নিজের সম্বন্ধেই বলতে কি ভারি সংকোচ বোধ করি। মনের মধ্যে উৎসাহসঞ্চয়ের প্রয়াস পাই। গীতার সেই মারাত্মক বাক্যটা—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—মনে-মনে ঝালিয়ে নিই একবার।

নৈতৎ ত্বয্যু পদ্যতে!—আওড়াতে-না-আওড়াতে পা উদ্যত হয়ে ওঠে। কাপুরুষতা কাঁপতে কাঁপতে পালায়।

ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!

পরন্তপ ততক্ষণে পাইপ ধরে উঠে পড়েছেন। বেশ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়েই উঠেছেন, তা আর বলতে হবে না।

পাইপ বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে উঠি। কখনো দেওয়ালের খাঁজে পা পড়ে নিজেকে আটকে নিয়ে একটু জিরিয়ে নিই, কখনো খাঁজ-ফাঁজ কোনোকিছুর খোঁজ পাইনে, দেয়ালের গায়ে পা দিয়ে হাতড়াতে থাকি, অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে হয়তো কখনো খাঁজের বদলে পাইপেরই একটা গাঁট পা দিয়ে হাতিয়ে ফেলি। এদিকে হাত অবশ হয়ে প্রায় বেহাত হবার গতিক। জরাজীর্ণ পাইপ কোনো উপায়ে একবার হাতছাড়া হলেই পদস্খলনের আর কিছু বাকি থাকে না।

হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে যেসব পাপ করেছি, বেশ বুঝতে পারি এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। বাড়ির সঙ্গে বাড়াবাড়ি আর কাকে বলে?

'অত দেয়াল ঘেঁষবেন না'—করুণাময়ী আইভির কোমল কণ্ঠ কানে আসে : 'দেয়ালে ঠেস দেবেন না অত। দেখছেন না কীরকম শ্যাওলা জমেছে দেয়ালে? জামাকাপড় খারাপ হয়ে যাবে যে!'

কিন্তু দেয়াল না ঘেঁষে দাঁড়াব কী করে? শ্যাওলারা সব আমার ন্যাওটা হয়ে পড়েছে তা টের পাচ্ছি বেশ, কিন্তু এ-অবস্থায় দেয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা আমার পক্ষে সুদূর পরাহত। হ্যাঁ—একদম সুদূর পরাহত, সুদূর পরাহতই যাকে বলা যেতে পারে। অক্ষরে-অক্ষরে হুবহু, একেবারে অনতিদূর মুহূর্তেই, এক দমে এবং একমাত্র কদমে, সুদূরে মাটিতে পড়ে আহত হবার ধাক্কা!

'আমি তো দেয়াল ছাড়তে চাচ্ছি কিন্তু দেয়াল আমাকে ছাড়ছে কই?' সকাতর কণ্ঠে আমি জানতে চাই : 'দেয়াল বাদ দিয়ে উঠব কী করে।'

'আহা, একটু আলগা হয়ে উঠুন-না! আকাশের দিকটায় হেলান দিয়ে, তা হলেই হবে।'

'আকাশে ভর দিয়ে উঠতে বলছেন? আকাশে?' আইভির অনুজ্ঞায় আমি ঈষৎ বিস্ময় বোধ করি : 'না, আকাশ ঘেঁষে ওঠা আমার পক্ষে অসাধ্য। এমনকি, আকাশে ঠেসান দেয়া পর্যন্ত অসম্ভব। একটুক্ষণের জন্যও। হ্যাঁ—'

আমার পরিস্থিতি, কিম্বা উপরিস্থিতি বললেই বোধহয় যথার্থ হবে—আইভির ঠিক বোধগম্য হয় না। নিচে থেকে সে চ্যাঁচাতে থাকে :

'কী যা-তা বলছেন! অমন লম্বা পাইপ। এতখানি ফাঁকা আকাশ! জামাকাপড় সামলে ওঠা যায় না নাকি?'

এমনভাবে বলে যেন সদাসর্বদা এই পথেই ওর যাতায়াত। আমি আর কিছু বলি না, কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দিই : 'জামাকাপড় মাথায় থাক, নিজেকে সামলে নিয়ে যদি উঠতে পারি, সে-ই আমার যথেষ্ট। এমনকি এখান থেকে এখন নিরাপদে নেমে যেতে পারলেও আর উঠতে চাই না।'

'এই তো দোতলায় পৌঁছে গেছেন। এবার খুব সহজেই উঠতে পারবেন। আর কষ্ট হবে না আপনার। আর একটু গেলেই জানালার কার্নিশটা!'

আর একটু গেলেই! তা-ই নাকি? সেই শ্যাওলা-সংকুল পাইপ-জটিল পরিত্রাহি অবস্থাতেই যতটা সম্ভব, ঘাড় বেঁকিয়ে, কাত হয়ে দেখবার চেষ্টা পাই, কিন্তু উক্ত কারনিসদুষ্ট জানালাটা মাটি থেকে তখন যতটা দূরে ছিল, এখনও ঠিক ততটা দূরেই রয়েছে বলে বোধ হতে থাকে।

'আচ্ছা, দোতলায় একটা জানালা খুলে ঢুকলে হয় না? হাতের কাছাকাছি আছে যেটা এখন?' আমি প্রস্তাব করি।

'উঁহুঁ! ওগুলোয় সব লোহার শিক দেয়া। তেতলার জানালাটা ছাড়া আপনার সুবিধে হবে না।'

'তা-ই তো—ভারি মুশকিল তো!'

আমার পা আর উচ্চবাচ্য করে না; হাতও যেন অবশ হয়ে আসে। আমি স্থগিত হয়ে পড়ি।

'একী, থেমে গেলেন যে! করছেন কী, ট্রেনের বেশি দেরি নেই আমার।' আইভি আমাকে তারস্বরে জানাতে থাকেন।

'একটু ভেবে নিচ্ছি।'

সংক্ষেপেই জবাব দিই। ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই আমার ভাবনার মধ্যে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

'এই কি আপনার গল্পের প্লট ভাববার সময়?' আইভির আর্তনাদ ওঠে : 'আমার ট্রেন ফেল করিয়ে দেবেন দেখছি।'

ট্রেন? ট্রেনের কথা মোটেই ভাবছিনে! নিজের ফেল বাঁচাই কী করে সেই এখন সমস্যা। মাস্টারদের হাতে পড়লে নিস্তার নেই, ফেল করতেই হবে, তা মেয়ে-মাস্টারই কী আর ছেলে-মাস্টারই কী, তাদের কাছ থেকে পাশ কাটানোই দায়।

'আমি বলি কি, মিস আইভি, তোমার এই পাইপ—সত্যি কথা বলব? মানুষের যাতায়াতের পক্ষে তেমন খুব প্রশস্ত নয়। উপাদেয় তো একেবারেই বলা যায় না।'

'পাইপ বেয়ে কখনো ওঠেননি কিনা তাই এ কথা বলছেন। প্র্যাকটিস থাকলে এমন কথা বলতেন না কখনও। বাড়ির মধ্যে যাবার ড্রেন-পাইপই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। কত মানুষ দুদ্দাড় করে পাইপ বেয়ে উঠে যায়, পড়েছি বিস্তর বইয়ে! এমনকি সদর দ্বার খোলা পেয়েও পাইপটাই তারা বেশি পছন্দ করে। পাইপ পেলে দরজার দিকে ফিরেও তাকায় না। পড়েননি আপনি?'

'না তো! কবে আর পড়লাম? বইটই আমি বেশি পড়িনি! লেখাপড়ায় আমার ভারি ভয়।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি বলি : 'উৎসাহই পাইনে, বলতে গেলে। তা ছাড়া লিখে আর ঘুমিয়েই কুলিয়ে উঠতে পারিনে, পড়ব কখন?'

যাক, আইভির কাছে একটা নতুন জিনিস শেখা গেল আজ! পুঁথিগত পাইপ-গতির রহস্য। সেইখানে, পাইপের উপর দাঁড়াবার ভানমাত্র করে—কেননা নিখুঁতভাবে বলতে গেলে হাতের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আমায়—সেইভাবে দাঁড়িয়ে ছোটবেলায় বেঞ্চিতে দাঁড়ানোর মর্যাদা বাঁচিয়ে, তটস্থ অবস্থায় নতুন শিক্ষা লাভ হতে থাকে আমার!

'বেশ, চেঞ্জে থেকে ফিরে এসে দেব আপনাকে খানকতক।' মিসেস আইভি আশ্বাস দেন : 'পড়ে দেখবেন।'

'পাইপ থেকে ফিরতে পারলে পড়ব বইকি!' আমিও ভরসা দিই, এবং অভিযান শুরু করি। ঝুলনযাত্রাকে ধারাবাহিক করে অবশেষে আমি তেমাথায় এসে হাজির হই। পাইপের তেমাথায়। সেখান থেকে, একটা সটান ঊর্ধ্বে, আর দুটো, তেরছা হয়ে ছাদের দু দিকে গিয়ে পৌঁছেছে।

'এইবার কোন পথে যাই!' জিগ্যেস করি আমি। আইভির এবং আমার নিজের উদ্দেশেই প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

'সোজা ডানহাতি পাইপ ধরে চলে যান। তা হলেই জানালার কাছে গিয়ে পৌঁছবেন। তারপর একটু এগুলেই সেই কারনিশ!'

ডানদিকে পাইপের দৈহিক অবস্থা দেখে আমার আশঙ্কা হতে থাকে। সুস্থ সবল বলতে যা বোঝায়, সে রকম আখ্যা কিছুতেই দেয়া যায় না সেই পাইপকে। খুব যে হৃষ্টপুষ্ট এমনও বলা চলে না। তেমন শক্তসমর্থ নয় বলেই আমার সংশয় হয়। আদৌ ওতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হবে কি না আমি ভাবতে থাকি।

যে রকম ওর আকার-প্রকার তাতে ওর ওপর নির্ভর করা যাবে কি না কে জানে! ও কি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে? হয়তো ওকে বিশ্বাস করেই শেষনিশ্বাস ছাড়তে হবে আমার। শেষ নাভিশ্বাস।

'ও কি যুঝতে পারবে আমার সঙ্গে?' ওর প্রতি আমার অনাস্থা জ্ঞাপন করি : 'যা ওর চেহারা!'

কিন্তু আইভির তাগাদা এদিকে।

'একদম নিরাপদ। কিচ্ছু ভয় নেই।' নিচের থেকে উচ্চৈঃস্বরে জানান দেয় আইভি। বহুবারের ভ্রমণকাহিনীর প্রবীণ অভিজ্ঞতা ওর কণ্ঠস্বরের নিঃসংশয়তার ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হতে থাকে।

কতক্ষণ আর সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান থাকা যায়? দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি এবং বিশেষণের অযোগ্য সেই পাইপের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে, ঝুলতে ঝুলতে, তেতলার কারনিসের দিকে এগুতে থাকি। প্রাণ এবং পাইপ একসঙ্গে হাতে করে যাই।

'বরাবর চলে যান। কোথথাও আপনার আটকাবে না। আমি বলছি!'

তা বটে। কোথায় আর আটকাবে! কেইবা আটকাচ্ছে? নাঃ, আটকাবার কোথাও কিছু নেই! মুখস্থ পড়ার মতো অবলীলায় গড়িয়ে গেলেই হল।

আর উচ্চবাচ্য করি না। কম্পিত কলেবরে দুরুদুরু বক্ষে এগোই। আমার তাড়সে, ড্রেন-পাইপটা একটু দমে যায় যেন! আমিও দমি।

পাইপের বিপথে নিজেকে চালিত করি, তেতলার দিকেই বটে, তবু কেন জানি না, তেতলা আর নিমতলা, খুব যেন কাছাকাছি, প্রতি হস্তক্ষেপেই এমনই যেন মনে হতে থাকে, এবং সেই অনিষ্টকর ঘনিষ্ঠতার দিকেই অম্লানবদনে এগিয়ে চলি। তেতলায় মাথা ঠুকবার আগেই নিমতলায় গিয়ে ঠেকব কি না কে জানে!

এক জায়গায় এসে ড্রেন-পাইপটা মড়মড় করে। আমি একটা চিৎকার ছাড়ি। পাইপের মতোই লম্বা এক চিৎকার!

'কী হল—কী হল আপনার?'

'আইভি! আইভি!—কিছু মনে কোরো না! লক্ষ্মী বোনটি আমার। কাউকে দিয়ে আমার বিছানাটা নামিয়ে নিয়ে, ঠিক আমার নিচেই এনে পাতো দেখি!'

আইভি অবাক হয়ে যায় : 'বিছানা! কী যা-তা বকছেন!'

আইভিকে আপনি বলতে বাধে আমার। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা রক্ষা করা কঠিন, আদবকায়দা বজায় রাখা ভারি শক্ত তখন। নিতান্ত পরও—অত্যন্ত শত্রুও সেই মারাত্মক মুহূর্তে ভারি আত্মীয় হয়ে ওঠে, অন্তত সেইরকম বলে ভ্রম হয়—সর্পতে রজ্জুভ্রম আর কি! যদিও তার কয়েক দণ্ড পরেই একান্ত যা আত্মীয়ও একেবারে পর ছাড়া কিছু নয়। আইভিকেও আমার ভয়ানক আপনার বোধ হতে থাকে তখন।

'একটা বিছানায় কুলোবে না, আইভি। পাড়ার সব বিছানা এনে জড়ো করো। করে পুঁজি করো নিচেটায়। ঠিক আমার নিচেই! উঁচুটা তো কম নয়, দেখছই! পড়লে কিছু কম লাগবে তবু।' রুদ্ধনিশ্বাসে বলি। 'পাইপই ভেঙে পড়ল বোধহয়। দেরি নেইকো আর। সম্ভবত আর বাঁচা গেল না। এ যাত্রাই খতম্।'

'পড়ছেন কোথায়? দিব্যি আটকে রয়েছেন তো!'

'অ্যাঁ! আটকে রয়েছি? তা-ই নাকি? পাইপ ভেঙে পড়ে যাইনি এখনও?' এতক্ষণে আমার নিশ্বাস পড়ে : 'পাইপটা ভাঙো ভাঙো হয়েছিল যেন। মর্মরধ্বনি শুনলাম কিনা!'

'কানের ভ্রম। ভুল শুনেছেন। দিব্যি লাগানো রয়েছে পাইপ—দেয়ালের সঙ্গে আস্ত।'

আইভির আশ্বাসে সত্যিই ভরসা পাই এবার! মনে-মনে ওকে ধন্যবাদ জানাই। ওকে এবং পাইপকে, দুজনকেই।

'কিন্তু যা-ই বলুন, মিস আইভি! পাইপগুলোয় গলদ আছে। তৈরি করবার সময়ে জল নামানোর দিকে যতটা লক্ষ রাখা হয়েছিল, মানুষ তুলবার দিকে ততটা নজর দেয়া হয়নি। এই পাইপটার কথাই ধরুন-না কেন। জল নামানোর পক্ষে যথেষ্টই, এমনকি, একে ওস্তাদও বলা যায়, কিন্তু মানুষ তুলতে একেবারেই কোনো কাজের না!'

'কতটাই-বা আর। হাত তিনেক তো মোটে! আর একটু পা চালিয়ে গেলেই, ব্যস।'

পা চালিয়ে? পা? পা কোথায় দেখতে পেলেন মিস আইভি? পা তো কবেই ইস্তফা দিয়েছি। পাইপপথে পা অপারগ। তবে কি আমার সামনের পা দুটোকেই, যাকে হাত বলেই ভ্রম করার কথা, মিস আইভি এভাবে কটাক্ষ করছেন? হাতের পদচ্যুতিতে প্রাণে লাগে, কিন্তু লাগলেই-বা কী করব? হাতও আমার চলৎশক্তিরহিত।

'না, আপনি মাটি করলেন। গাড়ি আর পেতে দিলেন না দেখছি!' আবার শ্রীমতী আইভির ভয়ার্তনাদ।

আমার ভয় হয়। উনি এখানে পড়ে থাকলেন, আমি উপরে থাকলাম, আর ওধারে ওঁর মালপত্র, চাকরের সঙ্গেই কি না কে জানে চেঞ্জে চলে গেল বেবাক!

আবার আমাকে সামনের পায়ে জোর দিতে হয়। পেছনের হাত দুটোকে দেয়ালের খাঁজে লাগিয়ে পুনরুন্নতি লাভের প্রয়াস পাই।

অবশেষে পাইপ ফুরোয়, নিঃশেষ হয় এক জায়গায় এসে। আমিও নিশ্বাস ফেলে জানালাটাকে ধরে ফেলি। কারনিশের ওপর বসি পা ঝুলিয়ে। পা এবং হাতকে যথাস্থানে উপভোগ করি আবার। এতক্ষণ বাদে—যদিও খুব সংক্ষেপের মধ্যে—তবুও বসে বেশ আরাম পাই।

'এইবার জানালাটা খুলে ফেলুন ঝট করে।' আইভি আবার উত্তাল হয় : 'ঝরকার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে দিন!'

কিন্তু হাত গলাই কোন ফাঁকে? যতই সাধি-না কেন, একটা ঝরকাও হাঁ করে না, হাঁ করলে তো হাঁকড়াব? ভেতর থেকে কে যেন ওদের চেপে রয়েছে। লোহার পাত মেরেই আটকানো কি না কে জানে?

'খুলছে না যে!' করুণ স্বরে বিজ্ঞাপন দিই।

'খুলছে না? কী মুশকিল! ফ্যাসাদ বাধালেন দেখছি।' আইভির আইঢাই ফুরোতে চায় না : 'আচ্ছা লোক তো আপনি!'

আবার আমি প্রাণপণে লাগি, ঝরকার সঙ্গে ঝটাপটি বাধিয়ে দিই—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তাছাড়া—কারনিশের কিনারায় বসে—ওইভাবে কায়ক্লেশে থেকে—ঝরকার কি আর কিনারা করতে পারব? ওইটুকু জায়গার মধ্যে কতখানি গায়ের জোর ফলানো যায়? বসে থাকাই দায়, বলতে গেলে।

'উঁহুঁ এসব ঝরকা খুলবার নয়। ভারি অবাধ্য এরা।' এই বলে জবাব দিই। আইভিকে আর ঝরকাদের।

'তা হলে সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে কী করে? তা হলে?' আইভির সাদাসিধে জিজ্ঞাসা।

এহেন ধারালো প্রশ্নে আমি কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। তা-ই তো, সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে কী করে? চোরেরা কি আমাদের চেয়েও চোখা আর চালাক? ভদ্রলোকদের চেয়েও বেশি ওস্তাদ এসব বিষয়ে? কিন্তু হঠাৎ আমার রাগ হয়ে যায়। নিজেকে আমি আর সংবরণ করতে পারি না। বলে উঠি : 'কী করে সিঁধকাঠি দিয়েছে তা আমি জানব কী করে?' রীতিমতোই রাগ হতে থাকে, সামলানো একটু শক্ত হয় আমার পক্ষে। আর তা ছাড়া, সিঁধকাঠি পাচ্ছিই কোথায় এখন?

হঠাৎ আমার মনে সংশয়ের ধাক্কা লাগে। খটকা জাগে কী রকম। ওর এই প্রশ্নটা—এই সিঁধকাঠির প্রশ্নটা একটু কেমন-কেমন যেন না? আমাকেই ঘুরিয়ে একটু নাক দেখানোর মতো নয় কি? ওর এই অমূলক প্রশ্নে—এই অন্যায় সন্দেহে আমার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। আমি চেঁচিয়ে উঠি :

'তাছাড়া, তাছাড়া সিঁধকাঠির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি কি... আমি কি...?'

আমি যে কী, আমি তা আর ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারি না। একটা অবান্তর ব্যাকুলতা আমার বুকের মধ্যে হুটোপুটি লাগিয়ে দেয়। কিন্তু ওর সন্দেহ ক্রমশ আমার মনে সঞ্চারিত হয়, আমার অন্তরেও ছায়াপাত করে। সামান্য ছায়া ঘন হয়ে ঘনীভূত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। আমিও নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করি।

এবং বেশ কাঁচুমাচু হয়েই বলি, বলে ফেলি এবার : 'তাছাড়া সিঁধকাঠিটা সঙ্গে করে আনা হয়নি তো'—অনুতপ্ত কণ্ঠেই প্রকাশ করি যেন : 'বাসাতেই পড়ে রয়েছে। ভুলে ফেলে এসেছি।'

'তা হলে আর কী করবেন? ছুরি দিয়েই ঝরকাটা কাটুন তবে।' আইভি নতুন ব্যবস্থাপত্র বার করে।

পকেট হাতড়ে দেখি—অবিশ্যি না হাতড়ালেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, ছুরিটুরির ধার বড় ধারিনে, দাড়ি কামানো প্রাক্তন ব্লেডেই পেনসিল চেঁছেছি চিরদিন; তবু যাবতীয় সন্দেহভঞ্জন করে ফ্যালাই ভালো।

'না! ছুরিও কাছে নেইকো!'

'ওঠবার আগে বলতে হয়। আমার কাছে ছিল ছুরি। এখন আবার ছুরি নেবার জন্য আপনাকে নেমে আসতে হবে। আরেকবার।'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মা-দুর্গা, মা-কালী এবং খোদাতাল্লা এবং মেরিমাতা প্রভৃতি আমার প্রিয়পাত্র সব দেবতার নাম স্মরণ করে নিই, তারপরে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে, পাইপ বেয়ে নেমে আসি সটান। উঠতে যতটা সময় লেগেছিল—তার চেয়ে ঢের কম সময় লাগে নামতে। তেতলা থেকে একতলা পর্যন্ত সারাপথে আমার স্মৃতিচিহ্ন ছড়াতে ছড়াতে আসি। কোথাও একটা বোতাম, কোনোখানে আধখানা পকেট, কোথাও জামার একটু হাতা, কোথাওবা কাপড়ের একটুকরো, এবং পাইপের সবনিচের গাঁটটায় খানিকটা চামড়া। প্রায় আধ ইঞ্চিটাক; আমার নিজেরই গায়ের।

'এই নিন ছুরি। এবার উঠতে বেশি বেগ পেতে হবে না আপনাকে। এখন মুখস্থ হয়ে গেছে কিনা! সহজেই উঠতে পারবেন এবার। কী করে পাইপ বেয়ে উঠতে হয় এখন বেশ বুঝে নিয়েছেন আপনি।'

হ্যাঁ, হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি! মনে-মনে বলি।

পুরো আধঘণ্টা লেগে গেল জানালা খুলতে আমার। পুরো আধঘণ্টার প্রাণান্ত পরিশ্রম। যাক, খুলেছি, খুলতে পেরেছি শেষটায়! নিচে, অব্যবহিত নিচেই, জনৈকা ভদ্রমহিলা না থাকলে, টার্জানের মতন পেল্লায় এক হাঁক ছাড়তাম।

বিরাট এক ডাক ছেড়ে দিগ্বিদিকে নিজের বিজয় ঘোষণা করে দিতাম। নিজের জয়ডঙ্কা! গৃহপ্রবেশের চূড়ান্ত করেছি।

পাল্লাগুলো ছাড়িয়ে, জানালার মধ্যে সবেমাত্র মাথা গলিয়েছি, কপালের ঘাম মুছেচি কি মুছিনি, শ্রীমতী আইভি বললে—

'ভেতরে আসতে পারছেন না? টপকে চলে আসুন!'

আওয়াজটা এত কাছাকাছি যে প্রথমে আমার মনে হল শ্রীমতী আইভিও যেন ড্রেন-পাইপ ধরে, আমার পেছনে পেছনে ধাওয়া করে প্রায় আমার আশপাশেই এসে দাঁড়িয়েছেন।

তার পরমুহূর্তেই তাঁকে দেখতে পেলাম ঘরের মধ্যিখানে।

'য়্যাঁ! একী?' আমি চমকে যাই, দম আটকে আসে আমার। 'ঘরের মধ্যে ঢুকলেন কী করে আপনি? চাবি খুঁজে পেয়েছেন নাকি?'

'চাবি তো হারায়নি', আইভি বলে—বেশ মর্যাদার সঙ্গেই বলে : 'চাবি হারাল কখন?'

'কী? তার মানে? তা হলে এত কাণ্ডকারখানা? এত হাঙ্গামা—এসব করা কেন?'

'আমি চলে যাচ্ছি কিনা, আজ দুপুরের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি। শিলং যাচ্ছি চেঞ্জে। বাড়ির মধ্যে সহজে সেঁধুনো যায় কি না, কেউ ঢুকতে পারে কি না, সিঁধ কেটে আসা যায় কি না সিধে, সেইটে জানার দরকার ছিল আমার। সদরে তো তালা—কারুর সাধ্যি নয় খোলে, জানালাও সব নিরাপদ, কেবল আমার ঘরের এইটাতেই গরাদ নেইকো। আমার এই জানালাটা নিয়েই ভাবনা ছিল ভীষণ। কিন্তু যাক, গরাদ না থাকলেও খড়খড়ি ফাঁক করে ছিটকিনি খুলে জানালা গলে সেঁধুনো যত সোজা বলে ভাবা গিয়েছিল, আসলে দেখা যাচ্ছে কাজটা তত সহজ নয় আদৌ। আর আপনি ছাড়া—না, সিঁধ কাটার কথা বলছিনে—তবু আপনিই ছাড়া এ-পাড়ায় আর এমন দুঃসাহস কার আছে বলুন? এ-পাড়ায় আপনিই তো কেবল গল্প লেখেন? এবার আমি, হ্যাঁ, অনেক নিশ্চিন্ত মনে চেঞ্জে যেতে পারব। খুব ধন্যবাদ আপনাকে... আপনি যে আমার জন্যে এতখানি ত্যাগ...'

তারপর শ্রীমতী আইভি যে আরও কী কী বললে, তার একটা কথাও কানে এল না। ততক্ষণে আমি নিজের আরও ত্যাগ স্বীকার করেছি—মাথা ঘুরে তিন পাক বেয়ে কী করে যে নেমে এসেছি মাটিতে, নিজেই আমি জানিনে!

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

যখন যেমন তখন তেমন

আগের থেকেই ওদের স্থির ছিল যে এবারের মহরমের তাজিয়াটা ওরা খুব প্রকাণ্ড করে করবে। হয়েছেও তা-ই, অন্যবারের চেয়ে এবারের তাজিয়াটা অন্তত ছগুণ বড় হয়েছে—আর উঁচুও হয়েছে প্রায় দোতলা বাড়ির সমান! তাজিয়াটা দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না—হ্যাঁ, একখানা তাজিয়ার মতো তাজিয়া বটে! এ-অঞ্চলের আর কারুর তাজিয়াকে ওদের ছাড়িয়ে উঠতে হবে না সে-সম্বন্ধে ওরা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু একটা হল মুশকিল। যে যে রাস্তা দিয়ে তাজিয়াটা যাবে তার দুপাশের কোনো কোনো গাছের শাখা-প্রশাখায় ওটার বাধা পাওয়ার আশঙ্কা রইল। এটা ওদের ধারণায় আসেনি, আজই প্রথম চোখে পড়ল হঠাৎ। তাই আজ মহরমের দিনে সকাল থেকেই গাছে গাছে লোক লেগে গেছে ডালপালা ছাঁটার কাজে!

এই নিয়ে আলোচনা চলছিল তর্কচঞ্চু ও ন্যায়বাগীশের মধ্যে—"এবার মুসলমানদের তাজিয়াটা বড় হল কেন জানো হে তর্কচঞ্চু! আমার জন্যই।"

বিস্ময়াবিষ্ট তর্কচঞ্চু বললেন—"বল কি হে ন্যায়বাগীশ, তুমি—তুমি—তোমার—"

"আহা, আমি কি ওদের কানে-কানে বলতে গেছি! আমার অভিশাপের জন্যই এটা হল।"

"তুমি অভিশাপ দিয়ে ওদের তাজিয়া বাড়িয়ে দিলে? শাপে বর হয়ে গেল যে হে!"

"আহা, আমি কি তাজিয়াকে অভিশাপ দিতে গেছি? সেদিন তোমায় বললাম না? বড় রাস্তা দিয়ে যেতে একটা ক্ষুদ্র প্রশাখা এসে পড়ল আমার পৃষ্ঠদেশে—তোমাকে বলিনি কথাটা? এখনও পৃষ্ঠে বেশ বেদনা রয়েছে!"

"বলছিলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তাজিয়াবৃদ্ধির সম্পর্ক তো খুঁজে পাচ্ছি না ভায়া।"

"তৎক্ষণাৎ আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বৃক্ষদের ব্রহ্মশাপ দিলাম, বড্ড বাড় বেড়েছিস তোরা। ভস্ম হয়ে যা। বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, এখনও প্রত্যহ কাঁচকলা দিয়ে হবিষ্যান্ন করি, আমার ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হবার?"

তর্কচঞ্চু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন—"ঠিক বুঝতে পারলাম না ভায়া! বড় রাস্তার গাছগুলো তো আজ প্রাতঃকালেও সজীব দেখেছি, ভস্ম হয়ে যায়নি তো।"

"এইবার হবে। সবুরে মেওয়া ফলে! সাপের বিষ ধরতে সময় লাগে, ব্রহ্মশাপের বেলাই কি অন্যথা হবে? কেন, দেখতে পাচ্ছ না? আজ প্রত্যুষ হতেই বড় রাস্তার শাখা-প্রশাখা সব কাটা পড়েছে, তাজিয়া যাবার জন্য। সেইসব ছিন্ন শাখা-প্রশাখা জমিদারবাড়ি চলে যাচ্ছে ইন্ধনের নিমিত্ত। একবার উনুনে ঢুকলে ভস্মসাৎ হতে আর কতক্ষণ হে?"

তর্কচঞ্চু নিশ্বাস ফেলে বললেন—"ও, এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা। তোমার ব্রহ্মশাপের ফল যে এতদূর গড়াবে আগে ভাবতে পারিনি।"

ন্যায়বাগীশ আস্ফালন করতে লাগলেন—"ঠিক হয়েছে, চূড়ান্ত হয়েছে। আজকাল ব্রহ্মশাপ ফলে না যারা বলে তারা দেখুক এসে। ওঃ, এখনও আমার পৃষ্ঠদেশে বেদনা রয়েছে হে!"

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকো টানতে টানতে উপস্থিত হলেন—"বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, সমস্তই মায়া!"

তর্কচঞ্চু বললেন—"তবু একটু সতর্ক হয়ে টানাই ভালো। যেভাবে হুঁকোটাকে ধরেছ, যদি কলকের আগুন নলচে টপ্‌কে গায়ে এসে পড়ে তখন সমস্তটা ঠিক মায়া বলে বোধ হবে না।"

হুঁকোটা পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে এসেছিল, বেদান্ত-শিরোমণি ওকে রাইট অ্যাঙ্গলে স্থাপন করে বললেন—"যা বলেছ! বিশেষত গায়ে না পড়ে যদি বস্ত্রে লাগে তবে তো পাঁচ সিকের ধাক্কায় ফেলেছে। বস্ত্র কী আক্রা হে আজকালকার বাজারে—আড়াই মুদ্রা জোড়া! ঠিক বলেছ তুমি তর্কচঞ্চু! সাবধানের বিনাশ নাই।"

ন্যায়বাগীশ বললেন—"স্মৃতিরত্নকে দেখছি না, আজ সকাল থেকে কোথায় গেল সে?"

জঙ্গিপুর গ্রামটিকে ব্রাহ্মণপ্রধান বলাই উচিত, কেননা ব্রাহ্মণরাই এখানে প্রধান—অন্তত তাদের নিজেদের কাছে। হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি শ্রেণীর কয়েক ঘর থাকলেও, তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কোনো সম্পর্ক নেই—না অন্তরের, না বাইরের। স্মৃতিরত্ন, তর্কচঞ্চু, ন্যায়বাগীশ, কাব্যতীর্থ আর বেদান্ত শিরোমণি—এই পাঁচঘর, চারিধারের ম্লেচ্ছতা আর অস্পৃশ্যতার সমুদ্রে মোহনার পাঁচটি ব-দ্বীপের মতো কোনো-রকমে নিজেদের মাহাত্ম্য ও শুচিতা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ম্লেচ্ছতার সমুদ্রই বলতে হবে, কেননা এর আশপাশ থেকে শুরু করে বহু দূর পর্যন্ত কেবল মুসলমান আর মুসলমান। চারিধারেই মুসলমানের বস্তি—জঙ্গিপুর নামের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। যখন পোলাও, কালিয়া আর মুরগি রান্নার সৌরভ এসে আক্রমণ করে তখন স্মৃতিরত্ন ঘনঘন নাকে নস্য দিতে থাকেন, কাব্যতীর্থ ওর ফাঁকে এক-আধটু ঘ্রাণে অর্ধভোজন করে নেন

হয়তো, কেবল বেদান্ত-শিরোমণি ঘনঘন হুঁকো টানেন আর বলেন—"মায়া, মায়া, সমস্তই মায়া!"

বলতে বলতে স্মৃতিরত্ন এসে উপস্থিত। তর্কচঞ্চু বললেন—"বহুদিন বাঁচবে তুমি হে! বহুকাল জীবিত থাকবে! এইমাত্র ন্যায়বাগীশ তোমার নাম উচ্চারণ করছিল।"

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকোটা তর্কচঞ্চুর হাতে দিয়ে বললেন—"বাঁচলে কী হবে, সমস্তই মায়া। ওর বাঁচাও যা, মরাও তা-ই।"

ন্যায়বাগীশ বললেন,—"উঁহুঁ, মরাটাকে ঠিক তা-ই বলতে পারি না! মরলে শ্রাদ্ধের একটা ভোজ পাওয়া যাবে, সেটাকে কি ঠিক মায়া বলা যায়? তুমি এই সাতসকালে কোথায় গেছলে হে স্মৃতিরত্ন?"

"আর বোলো না! একটা জাতিচ্যুতির ব্যাপার।"

সবাই আগ্রহে ঘন হয়ে এল—"বল কী হে? কার জাতিচ্যুতি হল আবার?"

"নতুন কূপটার। বুঝতে পারছ না? বাজারের নতুন ইঁদারাটার গো! মুচিরা বালতি ডুবিয়েছিল।"

কাব্যতীর্থ দূরে দাড়িয়ে দাঁতন করছিলেন, এইবার এগিয়ে এলেন, "তা ডুবিয়েছিল, অমনি কূপের জাত মারা গেল? এই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে যা জল-পিপাসা হয় তা কহতব্য নয়—আর মুচি বলে কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই ওদের? কোথায় যায় বেচারারা কও দেখি!"

স্মৃতিরত্ন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"তুমি থামো কাব্যতীর্থ। কাব্যের অনুশাসনে কিছু সংসার চলছে না। মনুসংহিতার বিধান মেনে চলতে হবে আমাদের। তোমাদের কী—কথায় বলে, নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।"

"ন্যায়বাগীশ রয়েছে, তা ছাড়া আবার কী? প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিলাম!"

বেদান্ত-শিরোমণি বিস্ময়ে বললেন—"ইঁদারার প্রায়শ্চিত্ত, সে আবার কী হে? ইঁদুরের প্রায়শ্চিত্ত হলেও নাহয় বুঝতাম; তবে একটা কথা, কিছুই বোঝার আবশ্যক করে না—সমস্তই মায়া কিনা!"

স্মৃতিরত্ন বললেন—"মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালার নামই প্রায়শ্চিত্ত—কূপের বেলায় কি তার অন্যথা হবে? শান-বাঁধানো মাথাটা চেঁছে ফেলা হল, তারপর পঞ্চগব্য দিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভালো করে মাজা হল, তারপর কলসপূর্ণ ঘোল ঢেলে দেওয়া হল কূপের মধ্যে!"

কাব্যতীর্থ দুঃখ প্রকাশ করলেন—"আহা, পেটে গেলে কাজ দিত হে! এই দারুণ গ্রীষ্মে ঘোলের শরবত অতি উপাদেয়!"

ন্যায়বাগীশ বললেন—"কিন্তু পাপ করল মুচিরা, প্রায়শ্চিত্ত কূপের। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে, এটা কীরকম ন্যায়সঙ্গত?"

স্মৃতিরত্ন বললেন—"তারও ব্যবস্থা করেছি। আমি কি সহজে ছাড়বার পাত্র? জমিদারবাড়ি হয়েই আসছি, ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে মুচিদের গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলে এলাম। একেবারে প্রায়শ্চিত্তের বাবা, কী বল হে তর্কচঞ্চু?"

তর্কচঞ্চু মাথা নাড়তে লাগলেন—"ভালো কাজ করনি হে! হাঁড়িজনরা সব হরিজন হচ্ছে আজকাল, একটু সতর্ক থাকতেই হয়। যদি বাগে পেয়ে গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়? অবশ্য আমরা গোরু নই এবং এখনও মরিনি—মরা গোরুরই ওরা ছাড়ায়। কিন্তু ভ্রম হতে কতক্ষণ? রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, আর ব্রাহ্মণে গোরুভ্রম হবে এ আর বেশি কথা কী?"

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকোটা হাতে নিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, এখন কিছুদিন সতর্ক থাকতেই হবে, যা ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন স্মৃতিরত্ন! যদিও সমস্তই মায়া তবু প্রাণের মায়াটাই হল তার মধ্যে প্রধান। সাবধানের বিনাশ নেই, কী বল হে তর্কচঞ্চু?"

তর্কচঞ্চু এমন সময়ে প্রস্তাব করলেন—"চলো, মহরমের তাজিয়াটা দেখে আসিগে! ন্যায়বাগীশের ব্রহ্মশাপের ফলে ওটার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসা যাক।"

স্মৃতিরত্নের নাসিকা কুঞ্চিত হল—"ম্লেচ্ছদের ব্যাপার...."

ন্যায়বাগীশের উৎসাহ দেখা গেল—"তাতে কী! দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে।"

কাব্যতীর্থ যোগ দিলেন—"তাজ আর তাজিয়া উভয়ই এক বস্তু শুনেছি। তাজমহল থেকেই তাজিয়ার উৎপত্তি মনে হয়! তাজমহল চাক্ষুষ করার আশা তো নেই কোনোদিন, তাজিয়া দেখেই আশ মিটানো যাক।"

বেদান্ত-শিরোমণি বললেন—"সবই মায়া জানি, তবু চলো। একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার যে তাতে সন্দেহ নাস্তি!"

যা শোনা গেছল সত্যি! এত বড় উঁচু তাজিয়া এ-অঞ্চলে দেখা যায়নি, অন্তত স্মৃতিরত্ন তো জন্মাবধি দেখেননি, কাব্যতীর্থ যেরকম হাঁ করেছেন তাতে মনে হয়, পরজন্মেও যে এত বড় তাজিয়া তিনি দেখতে পাবেন তেমন প্রত্যাশা তিনি রাখেন না। বেদান্ত-শিরোমণির কাছে সমস্তই মায়া, তিনি হুঁকোর ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এই অপূর্ব সৃষ্টিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আর ন্যায়বাগীশের কথা বলাই বাহুল্য, তাঁরই ব্রহ্মশাপের জোরে যেন তাজিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, সাফল্য-গর্বে হাসি তাঁর ধরে না আর।

কেবল কাব্যতীর্থের মুখ দিয়ে বাক্য বের হয়—"হ্যাঁ, তাজমহলই বটে!"

মহরমের শোভাযাত্রা বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু মুশকিল বেধেছিল ঐ তাজমহলকে নিয়েই। ওটাকে বইবে কে? কারা? যেমন উঁচু, ভারীও সেই অনুপাতে কিছু কম হয়নি। তা ছাড়া সবাই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে চায়, তাজিয়া বয়ে মরতে রাজি নয় কেউ। সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দেখিয়ে ওদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করল, "ওই হাঁদু মৌলবিদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিলে হয় না?"

ওদেরই মধ্যে যে একটু বিশেষজ্ঞ সে বলল—"চুপ চুপ, ওরা সব পান্‌ডিৎ। মৌলবি কইলে ওনাদের গোঁসা হইবে, তখন আর ওনারা কাঁধ দিতে রাজি হবেননি।"

প্রস্তাব শুনে 'পান্‌ডিৎদের' চক্ষু তো চড়কগাছ! ন্যায়বাগীশের এখনও পৃষ্ঠপ্রদেশের বেদনা মরেনি, তার উপর ওই ভারী তাজিয়া বইতে হলেই তো তাঁর হয়েছে! কতদূর নিয়ে যেতে হবে কে জানে! স্মৃতিরত্নের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল, তিনি আমতা-আমতা করে বললেন—"বাপু আমরা হলেম গিয়ে—আমরা গিয়ে—ও হে কাব্যতীর্থ, ম্লেচ্ছ কথাটার পারসিক প্রতিশব্দটা কী হে?"

শুষ্কমুখে কাব্যতীর্থ বললেন—"কাফের।"

"হ্যাঁ, আমরা হলাম গিয়ে কাফের। আমরা ছুঁলে তোমাদের দেবতা অশুদ্ধ হবে না?"

যাদের মিলিটারি মেজাজ তারা কথার ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করে না, আইন-কানুনের সূক্ষ্ম তর্কেও তাদের উৎসাহ নেই। স্মৃতিরত্নের অত বড় তত্ত্বজিজ্ঞাসার জবাবে এই সংক্ষিপ্ত কথাটা ওরা জানাল যে তাজিয়া বইতে রাজি না হলে মাথাগুলো রেখে যেতে হবে।

তর্কচঞ্চু স্মৃতিরত্নকে প্রশ্ন করলেন—"এ-সম্বন্ধে মনুর কি বিধান? যবনদের তাজিয়া বওয়া কি শাস্ত্রসম্মত?"

স্মৃতিরত্ন হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। কাব্যতীর্থ বলেন—"এ-সম্বন্ধে বেদবাক্য কিছু না থাকলেও প্রবাদবাক্য একটা আছে বটে, তাতে বলে—পড়েছে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।"

বেদান্ত-শিরোমণি বললেন—"যদিও সমস্তই মায়া তবু মাথাকে স্কন্ধচ্যুত করার চেয়ে তাজিয়াকে স্কন্ধে নেওয়াই আমার মতে সমীচীন। কী বল হে ন্যায়বাগীশ?"

ন্যায়বাগীশ কিছুই বলেন না, কেবল পিঠে হাত বুলান। শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে চলল জোয়ান ছোকরার দল লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে, তাদের অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স যাদের তারা সবাই লম্বা লম্বা লাঠি উঁচু করে—মুহুর্মুহু লাঠিতে-লাঠিতে ঠোকাঠুকি বাধানোই হল তাদের কাজ। তারপর চলছিল ছয়টা জয়ঢাক, তাদের আওয়াজে কানে তালা লাগবার যোগাড়। তাদের পেছনেই আরেক দল চলল—তাদের বুক বোধকরি পাথরের—তারা খালি 'হাসান হোসেন' বলে আর বুক চাপড়ায়। তার পরেই পান্‌ডিৎদের পৃষ্ঠারূঢ় চলমান তাজমহল। চলমান এবং টলমান।

তর্কচঞ্চু কাঁধ বদলে নিয়ে বলেন—"শাপটা দিয়ে ভালো করনি হে ন্যায়বাগীশ! এখন ঠেলা সামলাও।"

ন্যায়বাগীশের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ শোনায়—"আরে ভাই, কে জানে ব্রহ্মশাপের জের এতদূর গড়াবে।"

কাব্যতীর্থ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন—"ব্যাটারা অমন করে বুক চাপড়ায় কেন হে?"

বেদান্ত-শিরোমণি ভারি গম্ভীর হয়ে যান—"সমস্তই মায়া, কিন্তু মায়াদয়া নেই ব্যাটাদের। এত ভারী করার কী দরকার ছিল এমন! তা ছাড়া যা পেঁয়াজের গন্ধ ছেড়েছে—"

করাঘাতকারীদের একজন পণ্ডিতদের বলে—"হ্যাঁ দ্যাখো। তোমরা চাপড় দাও না ক্যান? ছাতি চাপড়াও।"

স্মৃতিরত্ন বললেন—"এর ওপর যদি আবার বুক চাপড়াতে হয় তা হলে তাজিয়া পড়ে যাবে কিন্তু।"

ন্যায়বাগীশ ভীত হয়ে ওঠেন—"সর্বনাশ! একেই আমার পৃষ্ঠে ব্যথা, তারপর তাজমহল-চাপা পড়লে আর বাঁচব না।"

ওরা বিরক্তি প্রকাশ করে—"চাপড় যদি না দিবা তো আমরা যা কইতেছি তা-ই কও।"

স্মৃতিরত্ন চাপা গলায় প্রশ্ন করেন—"কী বলছে ব্যাটারা বুঝতে পারছ কিছু?"

"বোধহয় বলছে—" তর্কচঞ্চু চুপিচুপি কথাটা জানান। স্মৃতিরত্ন ঘাড় নাড়েন—"ঠিক বলেছ, তা-ই হবে।"

ওরা বলতে বলতে চলে—"হাসান হোসেন, হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন..."

পণ্ডিতেরা অগত্যা যোগ দেন—"যখন যেমন, তখন তেমন! যখন যেমন, তখন তেমন..."

www.alorpathsala.org

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র